শিক্ষা-বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক প্রাইজ ও

লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

[কলিকাতা গেজেট, ৭ই মে, ১৯৪০]

"মরণের মুখোমুখি"-প্রণেতা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ও

শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম বার আনা। সংখ্যা ৪

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

পুনর্মুদ্রণ
বৈশাখ—১৩৫০

দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস. সি. মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত

গুলি করবার আগেই হঠাৎ পিছন দিক থেকে একদল খাসিয়া ওদের উপরে ঝাপিয়ে পড়লো।

বিভীষিকার মুখে

এক

কিং কঙ্

"রূপবাণী" সিনেমার সাম্‌নে—

ম্যাটিনী সবে মাত্র শেষ হ'য়েছে,—বাইরের গেট্‌গুলোতে ভীড়। যা'রা বেরিয়ে আস্‌ছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। মুখে তাদের নানা রকমের সমালোচনা।

একজন বল্‌লে, "স্রেফ্ আজগুবি, এমন হ'তেই পারে না।"

একটি চশ্‌মা-পরা ছেলে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে ব'ললে, "ও কথা কিছুতেই ব'লতে পারো না, তা জানো? পৃথিবীতে এখনো কত রহস্য মানুষের দৃষ্টির বাইরে র'য়েছে, তার সন্ধান কে রাখে? তা' ছাড়া, অন্ধকার দেশ আফ্রিকা, সেখানে কী যে আছে, আর কী যে নেই—"

আগের ছেলেটি ঠোঁট্ উল্‌টে বললে, "আরে রাখো ওসব। যত সমস্ত বাজে ই'য়ে—তাই নয় মেজদা?"

ওভারকোট-কাঁধে মোটা এক ভদ্রলোক ওদের সাম্‌নে সাম্‌নেই চ'লছিলেন, হাতে একটা কড়া বর্ম্মা-চুরুট। মুখের সাম্‌নে খানিকটা ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি ক'রে ব'ললেন, "হ'তেও পারে। তবে গল্পটা আজগুবি হ'লেও টাকা খরচ ক'রেছে যথেষ্ট। এমন একটা প্রোডাক্‌শান···"

বিভীষিকার মুখে

একটি মেয়ে তার ছোট বোনের উপর ধমক্ চালাচ্ছিল। পাশের মেয়েটি ব'ললে, "কি হ'য়েছে রে অনু, ব'ক্‌ছিস্ কেন রানুকে ?"

অনু মুখ ভেংচে ব'ললে, "নাঃ ব'ক্‌বে না! 'সেজদি ছবি দেখব, সেজদি ছবি দেখব', সে কী কান্না! সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম, কিন্তু সমস্তটা ক্ষণ কী জ্বালাতনই যে ক'রেছে ভাই, সে আর ব'লবার নয়! আঁৎকে, চেঁচিয়ে, সে এক কাণ্ড!"

সুতরাং এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, ছবিটা দর্শকদের মধ্যে খুব খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিল।

ক'রবারই কথা। ছেলে-মহলে সুপরিচিত,—রেডিয়ো-কোম্পানীর সেই নামজাদা ছবি 'কিং কঙ্'। আফ্রিকার জঙ্গল, অসভ্যদের দেশে সেই দৈত্য রাজা কিং কঙ্,—অতিকায় যুগের বিরাট্ বিরাট্ সব রাক্ষুসে প্রাণী,—বিশাল সমুদ্রের অজগর আর নিউ-ইয়র্কের বুকে কিং কঙের ধ্বংস-তাণ্ডব। দেখলে আতঙ্কে বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।

যারা সিনেমা থেকে পথে নেমে' এলো, তাদের মধ্যে অনেকেই একবার পেছন ফিরে শো-হাউস্‌টার দিকে তাকালো। সামনে বোর্ডের উপর মস্ত পোষ্টারে রাজা কঙের রুদ্রমূর্ত্তি. তা'র প্রকাণ্ড হাতের মুঠোয় একখানা এরোপ্লেনকে আঁকড়ে' ধ'রে সেটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে! চোখে তা'র জ্বলন্ত আগুনের দৃষ্টি,—রাগে উত্তেজনায় বিশাল বাহুর মাংস-পেশীগুলো ফুলে' উঠ্‌ছে।

রাস্তার ঠিক্ ওপারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে জটলা ক'রছিল। ওদের চেহারা এবং সাজ-পোষাক দেখে' বড় ঘরের ব'লে অনুমান করা শক্ত নয়। দলের মধ্যে যে ছেলেটি সব চাইতে বয়স্ক, সে অস্থিরভাবে

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব'ললে, "দেখেছো ড্রাইভারটার কাণ্ড! ঠিক ছ'টার সময় গাড়ী আনতে ব'লেছি, কিন্তু এদিকে সওয়া ছ'টা বাজে—"

ফর্সা লম্বা চেহারার একটি মেয়ে হেসে' উঠ্‌লো। ব'ললো, "তোমাদের ড্রাইভারের কাণ্ড তো! নিশ্চয় এতক্ষণে তা'র পাঞ্জাবী-ভাইয়াদের দোকানে ঢুকে' লাড্ডু চিবোচ্ছে, নইলে এক পোয়া ঘি আর আধসের আটা দিয়ে একখানা রাম্‌পরোটা তৈরি ক'রতে ব'সেছে।"

সোমেন ব'ললে, "দাদুর কাণ্ড তো জানো মলিনা, কোথা থেকে তার এক আই-সি-এস্‌ বন্ধুর সুপারিস যোগাড় ক'রে এনেছে, ব্যস্‌, আর কথা নেই!"

পাশের খর্ব্বাকার ছেলেটি এগিয়ে এসে ব'ললে, "রাখো তোমাদের মোটর, আর অপেক্ষা ক'রতে পারি নে' ওর জন্যে। চলো, পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিই এইটুকু পথ।"

মলিনা ব'ললে, "সুহৃদদা'র আইডিয়াটা ভালো। বেশতো, তাই চলো না সবাই, কত টুকুই বা রাস্তা—"

একটি কালো মেয়ে ভারী মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বিরক্ত ভাবে ব'ললে, "বাঃ, চমৎকার তো! পাক্কা দু'টি মাইল পথ, এখন সন্ধ্যেবেলা অত রাস্তা হেঁটে যাব! সে আমার দ্বারা হচ্ছে না!"

সুহৃদ ব'ললে, "ঠিক্‌, ঠিক্‌ মনে ছিলো না। চামেলীর জুতোর হিল্‌ যে বিদ্রোহ করেছে, তা জানো না? কাছাকাছি একটা মুচি পর্য্যন্ত নেই যে—"

মলিনা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ব'ললে, "ছাখ্‌ মিলি, তোকে দিয়ে পৃথিবীর কোনো কাজ হবে না। সব কাজেই তো তুই একটা না একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ব'স্‌বি।"

চামেলী চ'টে ব'ললে, "ঝঞ্ঝাট বাধানোটা বড্ড আমার হাত কিনা! জুতোর হিল্‌টা টক্ ক'রে খুলে গেল, প'ড়তে প'ড়তে অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়েছি।"

সোমেন ব'ললে, "এখন এদিক্ দিয়ে একটু শক্ত হ'তে হবে চামেলী! পশু'ই তো আমরা আসাম চ'ললাম, বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরতে হবে, দু'-চারটে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। তখন ঘন ঘন জুতোর হিল্ খুলে গেলে কিন্তু বিপদের কথা হবে।"

সুহৃদ ব'ললে, "আর শুধু বাঘ-ভাল্লুকেই যে শেষ হবে তাইই বা তোমাকে কে ব'ললে? মনে করো যদি আর একটা কিং কঙের সঙ্গেই দেখা হ'য়ে যায়?"

কিং কঙ্! সকলে হেসে' উঠলো। চামেলী বিস্ফারিত চোখে সামনের পোষ্টারটার দিকে তাকিয়ে ব'ললে, "বাব্বা! জঙ্গলের ভেতর এম্‌নি একটা মূর্ত্তির সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হ'য়ে গেলে—"

চামেলীর মুখের কথাটা টক্ ক'রে তুলে' নিয়ে মলিনা ব'ললে, "তাহ'লে এমন একটা চমৎকার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প তৈরি হবে! সত্যি, সোমেন দা, আমরা এই যে আসামের জঙ্গলে বেড়াতে চ'ললাম, দু'-চারটে অদ্ভুত কিছু কি আমাদের নজরে প'ড়তে পারে না?"

সোমেন গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, নিশ্চয়ই পারে। খাসিয়া পাহাড়ের অনাবিষ্কৃত নিবিড় জঙ্গলেব মধ্যে যে সব জীবজন্তু প্রচ্ছন্ন র'য়েছে, তাদের সকলেই যে আমাদের 'জু-গার্ডেনে'র পরিচিত ভাল মানুষ চিতা-বাঘ আর চিতা-হরিণের দলে প'ড়বে, এমন আশা করা যায় না।"

সুহৃদ ব'ললে, "বাঃ রে, আমরাও তো তাইই চাই। বাঙালীর

অপবাদ আছে ঘর-কুণো জীব ব'লে; সে অপবাদ আমরা ঘোচাতে চাই, একটা নতুন-কিছু ক'রে।"

চামেলী ব'ললে, "নতুন-কিছু বৈ কি! উপর দিকে পা ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো!"

সুহৃদ একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে ব'ললে, "সেটা তুমি তো এক্ষুণি ক'রতে যাচ্ছিলে মিলি, হিল্‌টা ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে—"

চামেলী ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

মলিনা ব'ললে, "সত্যি, আমরা যাচ্ছি সবাই,—বাবা যে কী ভীষণ খুসি হবেন তোমাদের দেখে! থাকেন তো ওই আসামের জঙ্গলে প'ড়ে—সিভিলিয়ানের ঐ এক জ্বালা! গৌহাটীতে বাঙালীর সংখ্যা একেবারে কম না হ'লেও, কিছুতেই ওখানে ওঁর মন ব'সতে চায় না। আমাকে চেয়েছিলেন নিয়ে যেতে; মাসীমা কিছুতেই নিতে দিলেন না। তাঁর ভয়, আসামে থেকে পাছে বুনো ব'নে যাই।"

সোমেন ব'ললে, "এবার তো সত্যিই ব'নে চ'ল্‌লাম, মাসীমা কিছু বলেন নি' এ-যাত্রা?"

মলিনা হেসে ব'ললে, "প্রোগ্রামটা তাঁ'কে এখনো সব বলিনি' কিনা। তবুও শাসাতে ছাড়েন নি'; ব'লেছেন, বেশীদিন থাকলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে···ইত্যাদি।"

ভোঁ ক'রে একটা বড় মোটর ওদের সাম্‌নে এসে' দাঁড়ালো। সোমেন ব'ললে, "এই যে হরনাম সিং, এত দেরী?"

দুই
চল্‌তি পথে

—হ্যালো সোমেন ?

—কে মলিনা ?

—হ্যাঁ, চামেলী বোধ হয় যাবে না। তার নিজের বিশেষ মত নেই, তা'ছাড়া বাড়ীতে আপত্তি।

—অল্‌রাইট্‌, কোন ক্ষতি হবে না। তুমি—আচ্ছা আমিই যাবো তোমাদের ওখানে—বিকালে। হ্যাঁ, ব'ল্‌তে পারো সুহৃদের খবর ?

—সুহৃদ ! হ্যাঁ যাবে।

—আচ্ছা !

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোমেন মহিমের খোঁজে গেল, যাত্রার সব ব্যবস্থা ক'রতে হবে। মহিম এ বাড়ীর চাকর। তবে সাধারণ চাকর ব'লতে যা বোঝা যায়—ঠিক তা নয়। মহিম এ বাড়ীতে এসেছে আজ প্রায় একুশ বৎসর। ও আসার এক বছর পরে সোমেনের জন্ম হয়। ওরই হাতে সোমেন একরকম মানুষ ব'ললেই চলে। সোমেনের মা বিধবা, ওর দাদু ভবানীবাবুর ঐ একমাত্র বিধবা-কন্যা ও নাতি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউই নেই। তাঁর বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী ও অতুল সম্পত্তি ভোগ ক'রবার একমাত্র সোমেনই অধিকারী।

বহু আপত্তি এবং কাঁদাকাটি অগ্রাহ্য ক'রবার পর দাদু এবং মার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য সোমেন স্থির সঙ্কল্প ক'রলে। তা'কে ছাড়া মহিমের কোন রকমেই চলে না, কাজেই মহিমকে সঙ্গে যেতে হ'লো।

সোমেন দরজার কব্জিটা জোর হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো,
"আসুন ভেতরে—"

বিভীষিকার মুখে

ভবানীবাবু মধ্যজীবনে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই দু'-একটা আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর আয়ত্তের ভেতরে থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়। তাছাড়া, সোমেনের নিজের পাশ ছিল এবং ভবিষ্যতে এগুলোর দরকার কতখানি, তাও সে জানত।

দলের ভিতর সোমেনই সিনিয়ার। সে এবার দিয়েছে বি. এ., সুহৃদ ম্যাট্রিক, আর মলিনা তার মামার বাসায় থেকে পড়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তার বাবার ওখানে বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা থেকেই হ'য়েছে এ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সূচনা।

যাওয়ার দিন ঠিক হ'লো, সবাই রওনা হবে সোমেনদের বালিগঞ্জের বাসা থেকে। ভবানীবাবু নিজে তাঁর মোটরে ওদের শিলং মেলে উঠিয়ে দিয়ে এলেন।

ওরা চ'লেছে—

বেলা প্রায় দু'টোর সময় গাড়ী ষ্টেশন ছাড়্‌লো। সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্ খুলে দিয়ে এক একটা জায়গায় এক একজন আশ্রয় নিয়েছে। একটা ম্যাগাজিন খুলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাষ্টার রায় ব'ললে—"তা হ'লে আমরা চল্লুমই মলিনা! তোমার বাবা প্রথমটায় আমাদের দেখে খুবই অবাক্ হ'য়ে যাবেন নিশ্চয়ই।"

মলিনা মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—"এত বোকাই পেয়েছ আমাকে যে কাউকে না জানিয়েই পথ চল্‌ছি। সকালে বাবার কাছে তার ক'রে দিয়েছি যে, কালকের সকালের গাড়ীতে আমাদের জন্য মোটর যেন তৈরি থাকে পাণ্ডু ষ্টেশনে।"

সুহৃদ ব'ললে—"মলিনার সেদিক্ দিয়ে ত্রুটি পাওয়া যায় না।"

সোমেন গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—"তাহ'লে এক কাজ করা যাক্ মলিনা! নির্জ্জলা বেড়ানো এখন আর ভাল লাগে না—

একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চার চাই। আমি জানি তোমাদের গৌহাটী থেকে মোটরে বরাবর খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত যাওয়ার রাস্তা তৈরি হ'য়েছে। খাসিয়া পাহাড় পার হ'য়ে তবে আমাদের অভিযান সুরু হবে।"

গাড়ী ছুটেছে পূর্ণবেগে। বাইরের গাছপালা, বাড়ীঘর তখন যেন ছুটে চ'লেছে উল্টো দিকে, ওরা কেউ বা খুলে বসেছে রোমাঞ্চকর উপন্যাস, কেউ বা ম্যাগাজিন।

পার্ব্বতীপুর থেকে গাড়ী যখন ছাড়্‌লো, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মহিম ওদের চা এবং খাবার নিয়ে আসতে কোনই ত্রুটি করেনি।

বাইরে তখন সুরু হ'য়েছে প্রকৃতির প্রচণ্ড লীলা। কালো মিশ্‌মিশে আকাশ থেকে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চারিদিক্ থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে। ঝড় আর মেঘের গর্জ্জনে সুরু হ'য়েছে এক রুদ্রলীলা। আর বাইরের এই অশ্রান্ত রুদ্ররোষ অগ্রাহ্য ক'রে গাড়ী ছুটে চ'লেছে বে-পরোয়া ভাবে।

হঠাৎ—

বাইরে দরজার গায় জোর শব্দ শোনা গেল। কে যেন প্রাণপণে অনবরত আঘাত ক'রে যাচ্ছে···।

চ'ম্‌কে উঠে ব'সে সেদিকে কান পেতে মলিনা ব'ললে— "সে কী সোমেন দা? কে যেন···গাড়ী কী থাম্‌ল?"

সোমেনও ব্যাপারটায় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে। সম্পূর্ণ ভীত না হ'লেও ব্যাপারটা তার কাছে নেহাৎ অস্বাভাবিক ঠেক্‌লো। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে স্পষ্ট বুঝলে, গাড়ীর গতি একটুও হ্রাস হয়নি। তাছাড়া, রাত তখন প্রায় দু'টো···। বাইরের এই দুর্য্যোগে···

মলিনা কম্পিত গলায় ব'ললে—"ডাকাত নয় ত?"

সোমেন গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে—"অসম্ভব কি ? ট্রেণে ডাকাতি তো প্রায়ই ঘটে।"

দরজার আঘাতটা ক্রমে প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌লো। সোমেন সুট্‌কেসের উপর হেলান-দেওয়া চামড়ার হাণ্টারটা হাতে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব'ললে—

—"তাইতো, সন্দেহজনক মনে হ'চ্ছে !"

মিস্ সেন তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—"তুমি যেও না সোমেন দা, দরজা খুলতে এখন। গাড়ীটা বরং থামুক না ; নইলে—নইলে চেন টেনে দিই বরং…"

বাধা দিয়ে সোমেন ব'লে উঠ্‌লো—"পাগল হ'য়েছ, মলিনা ? আগে দেখেনি' ব্যাপারটা কী ? ভয় কি, বিপদে পড়বার আগে অস্ত্রের কথা আমাদের স্মরণ হবে।"

ত্রস্তপদে এগিয়ে গিয়ে দরজার উপরের জানালাটা খুলে' দিতেই দেখ্‌লে, তাদের আতঙ্কের কিছুই নেই। বাইরে দৃঢ় হাতে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধ'রে দাঁড়িয়ে কোট্-প্যাণ্ট-পরা এক মনুষ্য-মূর্ত্তি ! পোষাকটা তার সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। সোমেন বুঝলে, বাইরের এই ঝড় এবং শিলা-বৃষ্টি সম্পূর্ণ এর উপর দিয়ে গেছে। হ্যাণ্ডেল ধ'রে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এর আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

জানলাটা খোলার সাথে সাথেই সেই মনুষ্য-মূর্ত্তিটা সোমেনকে আশ্চর্য্য ক'রে বিশুদ্ধ বাংলায় ব'লে উঠ্‌লো—"আপনারাই বুঝি এ গাড়ী রিজার্ভ ক'রেছেন ? দয়া ক'রে দরজাটা একটু খুলুন। আমি এইভাবে…"

তার কথা শেষ হবার আগেই ত্রস্তপদে সোমেন দরজার কব্জিটা জোর হাতে ঘুরিয়ে দিল। ব'ললো—"আসুন ভেতরে।"

একলাফে গাড়ীর ভিতর ঢুকে' পাশের আয়না-দেওয়া

আল্‌নার গায়ে মাথার ভিজে টুপিটা ঝুলিয়ে রেখে তিনি ব'ললেন,—"আমিও এ-গাড়ীর একজন প্যাসেঞ্জার। মাঝের একটা ছোট স্টেশন থেকে উঠেছি ও এই ঝড়-বাদলের মধ্যেই দৌড়ে এসে কোনরকমে চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়েছি।"

মলিনা ব'লে উঠ্‌লো—"কিন্তু, এভাবে বাইরের ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার চেয়ে আমাদের গাড়ীতে স্থান নেওয়াটা বোধ হয় অনেক ভালো ছিল।

ভদ্রলোক অপ্রতিভভাবে হাস্‌লেন, ব'ললেন—"দেখুন, এ-কথা যে আমার মনে হয়নি, তা নয়। তবে রিজার্ভ গাড়ী দেখে কেমন সন্দেহ হ'লো—এ হয়তো কোন বিলিতি পরিবার। ডাকাডাকিতে হয়তো আবার এক নূতন ফ্যাসাদ বাধবে। তবে জোর বৃষ্টির সাথে যখন শিলাবৃষ্টি সুরু হ'লো, তখন আর স্থির থাক্‌তে পারিনি'—অস্থিরভাবে অনেকবার দরজায় আঘাত ক'রেছি। আজ দেখলুম···"

মলিনা ব'লে উঠ্‌লো—"কই, আমরা তো কিছুই টের পাইনি!"

সোমেন ব্যস্তভাবে বললে—"বাইরের শব্দে ভেতরে টের না পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে যাক্‌—। আমি আমার জামা-কাপড় বের ক'রে দিচ্ছি, আপনি পোষাকটা ব'দ্‌লে নিন্‌।"

তিন
আত্মকাহিনী

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ ক'রছে নিকষ-কালো রাত !

একটু আগেই ঝড়-বৃষ্টির উপদ্রব গেছে শান্ত হ'য়ে—চারিদিকের পৃথিবী একটা গম্ভীর স্তব্ধতায় যেন ঝিমিয়ে প'ড়েছে !

—আর সেই ঝিমিয়ে-পড়া মৌনকে বিদ্রূপ ক'রে গাড়ীটা ডাকাতের মতো হৈ রৈ ক'রতে ক'রতে ছুটে চ'লেছে—অন্ধকারকে ঝ'লসে দিচ্ছে, সার্চ-লাইটের তীব্র আলোর ঝলক্ ! লোহায় লোহায় বেজে' উঠ্ছে ঃ ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ—

নিশীথ রাতের মাঝখানে যেন একটা আগুনের তীর···

গাড়ীর কাচের জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—দু'-ধারের জমাট্-বাঁধা অন্ধকার ঝট্কায় ঝট্কায় পেছনে স'রে যাচ্ছে,—গতিবেগের সাথে সাথে একটা শন্‌শনে ক্ষ্যাপা শব্দ···

মলিনার চোখ দু'টি এসেছে ঝিমিয়ে, ওদিকে সুহৃদ বাঙ্কে উঠে' সটান্ হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু ঘুমায়নি সোমেন, আর সেই চ'ল্‌তি-গাড়ীর আকস্মিক আগন্তুকটি।

রতীনবাবু বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে' আছেন, কী ভাবছেন, কেই বা ব'লতে পারে সে কথা ? সোমেনের কোলের উপর খোলা সেদিনের একখানা খবরের কাগজ,—কিন্তু ওর মনটা খবরের কাগজের বাইরে অনেকদূর চ'লে গেছে।

রতীনবাবুই প্রথমে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন —"কোথায় যাচ্ছেন আপনারা, সেটা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেসই করা হয়নি'—অথচ নিতান্ত উপদ্রবের মতো আপনাদের গাড়ীতে এসে উঠে ব'সলাম।"

"ছি, ছি, কেন আপনি ও কথা মনে করছেন ?" সোমেন ব'ললে : "বেড়াতে যাচ্ছি—আসাম।"

—"কোথায় নামছেন ?"

সোমেন কোলের উপর থেকে কাগজ নামিয়ে ভাঁজ ক'রে রেখে' ব'ললে,—"আপাততঃ পাণ্ডু। তারপর ওখান থেকে মোটরে গৌহাটী, একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে···কিন্তু আপনার আসাটা এত অদ্ভুত রকমের যে, আপনার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস ক'রলে কী—···"

—"ক্ষেপেচেন ?"—ভদ্রলোক হেসে ব'ললেন—"একটা অচেনা-অজানা লোককে যখন গাড়ীতে উঠ্‌তে দিলেন, তখনই তো আপনাদের কর্ত্তব্য ছিলো তাঁর পরিচয়টা জেনে নেওয়া! —আমিও গৌহাটীতেইথাকি, এন্‌জিনিয়ার। কিন্তু এন্‌জিনিয়ারী করিনে'।"

—"হ্যাঁ, টাকা থাকলে", সোমেন জবাব দিলে, "কোন একটা পেশাকে না মেনে নিলেও চলে।"

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, ব'ললেন,—"না তা ঠিক নয়! টাকা যদিও কিছু আছে, তবু তা' সারা জীবন ব'সে খাওয়ার মতো নয়; কিন্তু আমার জীবনে একটা খুব বড় উদ্দেশ্য আছে; যে জন্য বাইরের কাজে কোনো মন দিতে পারিনে।"

সোমেন কৌতূহলে ব'ললে—"কোন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নাকি ?"

রতীনবাবু পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ বের ক'রে সিগারেট ধরালেন, সিগারেটের নীল আগুনে তাঁর মুখের উপরে কেমন একটা অদ্ভুত রহস্যময় জিনিষ যেন দেখা গেল। ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন গম্ভীর হ'য়ে উঠল :—"দেখুন সোমেনবাবু, জীবনে আমরা যতটুকু নেহাৎ সাধারণ ভাবে দেখ্‌তে পাই, এই পৃথিবীর অসংখ্য

রহস্যের এবং বৈচিত্র্যের কাছে তারা কিছুই নয়। ব'ললে কী আপনি বিশ্বাস ক'রতে পারেন—এই মুহূর্ত্তে আমরা যেখান দিয়ে ছুটে চ'লেছি,—এই যে সভ্যতায় গড়া নূতন জগৎ,—এখান থেকে দেড়শো মাইলের মধ্যে, এই পৃথিবীর বুকে এখনও এমন জায়গা,—এমন ভয়াবহ অতিকায় পশুপক্ষী বাস ক'রছে,—যা আমাদের প্রত্যক্ষ-করা অনেক বিভীষিকার চাইতেও ভয়ানক!"

সোমেনের আগ্রহ জ্বলন্ত হ'য়ে উঠ্ল, ব'ললে—"কী রকম?"

ভদ্রলোক হাতের সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে' দিলেন, তারপর একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন—"আজ আপনার কাছে সামান্য-একটু কাহিনী ব'লব,—যে কাহিনী বর্ত্তমান সভ্য পৃথিবীর যে-কোন সভ্য মানুষের পক্ষে অসাধারণ রকমের অবিশ্বাস্য। কিন্তু এই কাহিনী আপনার আমার অস্তিত্বের মতো প্রখর জ্বলন্ত সত্য। পৃথিবীতে শুধু দু'টি লোক এই কাহিনী জানে, তার একজন আমি, আর একজন খাসিয়া পাহাড়ের গভীর অরণ্যে সেই মূর্ত্তিমান্ দুঃস্বপ্নের মতো অতিকায় হিংস্র ক্ষুধিত প্রাণীর শাণিত থাবার নীচে প্রাণ দিয়েছে।"

প্রবল বিস্ময়ে এবং দারুণ কৌতূহলে সোমেনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্ল। রুদ্ধস্বরে ব'ললে—"অনুগ্রহ ক'রে সবটা খুলে বলুন।"

রতীনবাবু আবার সেই রহস্যময় হাসি হেসে উঠ্লেন। বাইরের রাত্রির নিবিড়তা, আর তাঁর সেই বিচিত্র হাসিতে সোমেনের মনটা যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। তিনি ব'ললেন, "আমি জানি, এ আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না, আর না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন শুনতে চেয়েছেন, তখন আপনার

কাছে খুলেই ব'লব। আপনার যে ভাবে ইচ্ছে আপনি এটা সেই ভাবেই নিতে পারেন।"

"—তখন বৈশাখ মাস। আমি আমার এরোপ্লেনখানা নিয়ে নিয়মিত ভাবে আসামের পাহাড়-পর্ব্বতের উপর চরকি দিতে বেরিয়ে প'ড়েছিলুম। পাহাড় আর বন-জঙ্গলের মাঝখানেও পথ হারাবার ভয় ছিল না ; কারণ, সঙ্গে ছিল কম্পাস্, আর ছিল আমায় পথ দেখাবার জন্য সঙ্কীর্ণ একটি নদীর রূপালী ক্ষীণ জলধারা,—সবুজ পাহাড়ের কাঁধে সাদা পৈতেটির মতো।

খেয়াল-খুসী মতো চ'লেছিলুম, কিন্তু বৈশাখের অবিশ্বাসী বেলার খেয়ালের কথা কে ব'লবে? হঠাৎ একসময়ে আকাশে যখন গুর্ গুর্ ক'রে মেঘ বেজে' উঠ্ল, তখন আর সামলাবার সময় ছিলো না—কাল-বৈশাখী এসে প'ড়েছে। আমার সঙ্গে ছিল আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ জ্ঞানেন্দ্র, সভয়ে ব'ললে, 'স্যার, শীগ্‌গির প্লেন নামিয়ে ফেলুন, ঝড় আস্‌ছে।'

—কিন্তু প্লেন নামাবো এমন গ্রাউণ্ড কোথায়? নীচে যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য তীক্ষ্ণ পাহাড়ের চূড়ো—আর নিবিড় সবুজ জঙ্গল। সেখানে এরোপ্লেন নামাতে যাওয়া মানে মৃত্যু অনিবার্য্য। ওদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগ্‌লা ঝড় ছুটে' এলো জটা দুলিয়ে—এরোপ্লেনের পাখায় হান্‌লে তার তীব্র আঘাত। এরোপ্লেনের সমস্ত 'বডিটা' ঝন্ ঝন্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল—ঝড়ের গানে প্রপেলারের শব্দ কোথায় যে গেল তলিয়ে!

—উঃ সে কী মুহূর্ত্ত! জীবনে এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে আর কখনো যুদ্ধ ক'রেছি ব'লে মনে প'ড়ছে না। প্রতি সেকেণ্ডে মনে হচ্ছে,—এক্ষুণি বোধহয় ঝড়ের দমকায় এরোপ্লেন দু'হাজার ফিট্ নীচের পাহাড়গুলোর উপর আছড়ে প'ড়ে শতচূর্ণ হ'য়ে

যাবে,—সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে আমাদের দু'জনের ক্ষীণ অস্তিত্ব !—

ঝড় আর বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এরোপ্লেন ছুটল, কোথায় কে জানে ! দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা পরে আমরা যখন মৃত্যুর সংগ্রাম থেকে আত্ম-রক্ষা ক'রতে পারলাম, তখন চোখে পড়ল, আমাদের পরিচিত পথের অস্তিত্ব কোথাও নেই ! আমরা কোথায় কোন্ এক অজ্ঞাত জগতে এসে প'ড়েছি—গৌহাটী থেকে কতদূরে তাই বা কে ব'লবে ! একদিকে ঝড়, আর একদিকে প্লেনের স্পীড্,—পথের মাত্রা ঠিক ক'রে বোঝা অসম্ভব !

ঝড় থেমেছে,—ভালো ক'রে নীচের দিকে চেয়ে দেখলুম, দু'পাশে দীর্ঘ সরল গাছের শ্রেণীর মাঝখানে বিস্তৃত সমতল উপত্যকা—চমৎকার ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড ! আমরা তখন অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ক্লান্ত, পথ খুঁজে নেবার আগে একটু জিরিয়ে নেবার মতলবে দু'-একটা চক্র দিয়ে প্লেন নামিয়ে ফেললুম ।

জ্ঞানেন্দ্র নেমে ব'ললে—'চমৎকার জায়গাটা স্যার্ ! আমি একটু ওদিক্ থেকে বেড়িয়ে আসি'—ব'লে দূরের সরল গাছ-গুলোর দিকে পা চালিয়ে দিলে ।

ব'ললাম ঃ—'তাড়াতাড়ি কোরো জ্ঞানেন্দ্র, দেরী কোরো না । আবার পথ খুঁজে নেওয়ার হ্যাঙ্গাম,—তাছাড়া, বেলাও প'ড়ে এলো ।'

জ্ঞানেন্দ্র ব'ললে, 'না স্যার, এক্ষুণি আস্‌চি ।'

ও চ'লে গেল । আমি তখন মোটরটা খুলে' মেশিনগুলো পরখ ক'রতে আরম্ভ ক'রলাম । ঝড় কতটা ক্ষতি ক'রতে পেরেছে, দেখা যাক্ ।

হঠাৎ—

জ্ঞানেন্দ্রের একটা আর্ত্ত-চীৎকারে সেই নির্জ্জন উপত্যকার

আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল। সেই মুহূর্ত্তে যে ভীষণ দৃশ্য দেখ্‌লাম, তা' ভাবতেও পায়ের তলা থেকে মাথার চুলের আগা পর্য্যন্ত ভয়ের বিদ্যুৎ ব'য়ে যায়! পৃথিবীতে এমন ভীষণ বিভীষিকাও যে বিদ্যমান আছে, তা আমি ভুলেও ভাব্‌তে পারিনি। আমি স্পষ্ট দেখলুম্, ওদিকের সরল গাছের শ্রেণীর ভিতর দিয়ে মূর্ত্তিমান আতঙ্কের মতো এক বিশাল জানোয়ার বেরিয়ে আস্‌ছে! উচ্চতায় সে ষোলো-সতেরো হাতের চেয়ে এতটুকু খাটো নয়,—দেখ্‌তে একটা প্রকাণ্ড বাইসনের মতো,—মাথায় দু'টো বিরাট তলোয়ারের মতো শিং,—লেজ তুলে গর্জ্জন ক'রছে—

সে কী গর্জ্জন! একটা নয়, দু'টো নয়, তিন-চারটে! সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি চারিদিক্ থেকে সেই মৃত্যু-দূতের দল পিল্ পিল্ ক'রে বেরিয়ে আস্‌ছে।

আর ভাবনার অবকাশ ছিল না। বুঝলাম জ্ঞানেন্দ্র আর ফিরবে না,—ফিরতে পারে না। মুহূর্ত্তে আমার এরোপ্লেন দু'-চাকায় ভর ক'রে বিদ্যুদ্ বেগে সামনে ছুটে এসে আকাশে উঠে গেল। নীচে চেয়ে দেখ্‌লাম, সেই অসংখ্য অতিকায় প্রাণীতে সমস্ত উপত্যকাটা আচ্ছন্ন···তাদের বিকট হুঙ্কারে সমস্ত আকাশটা কেঁপে উঠ্‌ছে!

তারপরে দু'দিন লক্ষ্য-হারা হয়ে ঘুরবার পর অনেক পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে যখন গৌহাটীর পথের হদিশ পাওয়া গেল,—তখন আমার জ্ঞান প্রায় হারিয়ে যাওয়ারই উপক্রম করেছিল।"

সোমেন এতক্ষণ স্তব্ধভাবে বসেছিলো। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ললে,—"উঃ কী ভীষণ! তারপর?"

অনেকগুলো পয়েন্টের কর্কশ শব্দ,—গাড়ীর গতি মন্দা হ'য়ে এসেছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বোঝা গেল, ট্রেণ আমিনগাঁ এসে প'ড়েছে।

চার
আসামে

তখন প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। গৌহাটীতে মলিনাদের বাড়ীর প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হলে বেশ আড্ডার সৃষ্টি হ'য়েছে—সোমেন, সুহৃদ, রতীনবাবু—সবাই সেখানে উপস্থিত।

মলিনা চা তৈরি করার কাজে লিপ্ত—টুকিটাকি জিনিষপত্র এগিয়ে দিয়ে মহিম তার সাহায্য ক'রছে।

একটা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোমেন ব'ললে—"তা হ'লে তাই ঠিক, কী বলেন রতীন বাবু? আগামী কাল আপনার 'টুরিষ্ট কার'-এ আমরা রওনা হব খাসিয়া পাহাড়ের পথে..."

এক টুকরো কেক ভেঙ্গে মুখে পূরে দিয়ে রতীনবাবু ব'ললেন—"কিন্তু আমি বলি কী,—'টুরিষ্ট কার' বরং এখন থাক্। কেননা এখন বর্ষার দিন এসে প'ড়েছে—মোটরে পথের বিশেষ সুবিধা পাব না। এরোপ্লেনেই যাব—অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘুরে দেখে আসা যাবে। ক্যামেরা আপনার সাথে আছে তো?"

—"নিশ্চয়ই! এ-সব কাজে ও-জিনিষটা না হ'লে চলে না, তা আমি বেশ জানি।"

—"চমৎকার!"

—"কিন্তু দু'দিন জিরিয়ে নিলে চ'লতো না? এই তো সেদিন এলে এতদূর থেকে"...চায়ের বাটিতে চিনি ঢালতে ঢালতে মলিনা ব'ললে।

—"ও জিনিষটায় আমার অরুচি চিরদিনই"—সোমেন হাসতে হাসতে ব'ললে।

"সে থাক",—বাধা দিয়ে রতীনবাবু ব'লে উঠ্‌লেন,—"এখন কাজের কথা হচ্ছে যে—অভিযানের পথে বেরোবার আগে

কয়েকটা জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সচেতন হ'তে হবে। খাসিয়া পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আমাকে আরো কয়েকবার যেতে হ'য়েছে,—কাজেই এ-বিষয়ে আমার যথেষ্ট জানা আছে। এ রকম দুর্ভেদ্য জঙ্গল—হিংস্র এবং ভয়ানক জানোয়ার এবং সবচেয়ে বড় কথা এর অধিবাসীদের মতো হিংস্র মানুষ যে পৃথিবীতে থাকতে পারে—তা' ধারণারও অতীত। কাজেই এরোপ্লেনে যথেষ্ট পেট্রোল যোগানো থাকলেও অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে সবচেয়ে বেশী। তবে হ্যাঁ—" রতীন বাবু চিন্তিত ভাবে ব'ললেন—"সে ব্যবস্থা হ'তে পারবে।"

সোমেন ব'ললে—"আমার অস্ত্র আমার সঙ্গেই আছে।"

প্রবল আনন্দে রতীন হেসে ব'ললেন—"বাঃ, এই তো চাই!"

স্যাণ্ডেলের চট্‌পট্‌ শব্দ ক'রতে ক'রতে মলিনার মণিদা এসে ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ার টেনে ব'সেই ব'ল্লেন—"হ্যাঁরে লীনি,—দে দেখি আমাকে এককাপ—।"

রতীনবাবু প্রচুর উৎসাহে মুখ উদ্দীপ্ত ক'রে ব'ললেন—"এই যে মিহির! প্রস্তুত তো? কালকে আমরা যাচ্ছি এরোপ্লেনে; আশা করি আমাদের সঙ্গ নিতে তোমার কোন আপত্তি নেই!"

—"বটে! কতদূর?"—সোৎসাহে মণিদা জিজ্ঞেস ক'রলেন।

—"আপাততঃ খাসিয়া পাহাড়, তারপরে যেখানে ইচ্ছে"—সুহৃদ ঈষৎ হেসে ব'ললে।

—"উত্তম, আমি ষোলোআনা রাজি। জানোতো—সেবার সিকিমের ওদিকে গিয়ে কী রকম বালিহাঁস শিকার ক'রে নিয়ে এলুম—এক এক গুলিতে সাত-আটটা প'ড়লো। সাথে ছিলো মিষ্টার ব্যারেট্‌—ছুটে এসে পিঠ্‌ চাপড়ে ব'ললো—'ব্রেভো!' আরো কত কী!"

এক চুমুকে চাটুকু নিঃশেষ ক'রে কাপটা নামিয়ে রেখে

রতীনবাবু ব'ললেন—"কিন্তু এক্ষেত্রে 'ব্রেভো' পেতে হ'লে আরো কিছু কসরৎ দরকার হবে মিহির! যে বিপদের ভেতরে তুমি অগ্রসর হ'চ্ছ, তা'তে নিজের জীবনটা পদে পদে হাতের মুঠোয় ধ'রে তোমাকে চ'লতে হবে। এরপর সবাই আমরা ফিরে আসব কি না, তাই বা কে জানে?"

চিন্তিত ভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মণিদা ব'ললেন—"বটে! তা হ'লে, তা হ'লে তো একটু চিন্তার কথাই। আমার আবার কোর্ট বন্ধ ক'রে যেতে হয়—আচ্ছা সে যাক্, আমি যাবই; কিন্তু—লীনি, তুই যেতে পার্‌বিনে—"

প্রতিবাদের সুরে মলিনা ব'ললে—"বাঃ, এই জন্যেই তো কষ্ট ক'রে ছুটিতে এবার আসা। এখন তুমি দিব্যি ব'লছ··· আমি না গিয়ে ছাড়বো না—সে ব'লে দিচ্ছি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রতীনবাবু ব'ললেন—"আচ্ছা, ওর যখন এতই ইচ্ছে—তখন না হয় যাক্‌ই! ···এরোপ্লেনে নিশ্চয়ই অভ্যেস আছে?"

—"নিশ্চয়ই",—দৃঢ়স্বরে মলিনা ব'ললে—"এই তো সেবার আমরা পুরী গেলুম না এরোপ্লেনে? তাছাড়া, আরও অনেক-বার···"

—"হ্যাঁ"—সিগারেটটায় একটা জোর টান দিয়ে রতীনবাবু ব'ললেন—"এরোপ্লেনটাকে একটু দেখে নিতে হ'বে। এঞ্জিনে একটু গোলমাল আছে—তা দু'-একঘণ্টার ব্যাপার। তা ছাড়া, মোটামুটি এ ক্ষেত্রে যা দরকারী, তা প্রায় সবই আমার কাছে একরকম তৈরি আছে। তা হ'লে ঠিক হ'লো—কালই আমরা রওনা হব—বেলা গোটা আটের সময়—কী বলো?"

বাধা দিয়ে মণিদা হঠাৎ ব'ললেন—"কাল যাওয়া কোন রকমেই হ'তে পারে না। কাল যে ত্র্যহস্পর্শ দোষ—শেষটায়

বেঘোরে প্রাণ হারাব? 'যাত্রা নাস্তি' একদম স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে—"

সোমেন ব'ললে—"কিন্তু আমার মনে হয়, কালই আমাদের ঠিক যাত্রার দিন। অভিযানের বেলা পঞ্জিকা খুলে ব'সলে চ'লবে না—ওটা বরং হাওয়া খেতে বেরোবার জন্য।"

টেবিলে হাত চাপড়িয়ে রতীনবাবু ব'লে উঠলেন—"এই তো চাই! সোমেন ঠিক ব'লেছে মিহির, ঘটা ক'রে সিমলা বেড়াতে যাওয়া আর এখানের বিপদের বেড়াজালের ভেতরে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই প্রভেদ দেখ্‌তে পাবে।"

অপ্রতিভ ভাবে মাথা চুলকিয়ে মণিদা ব'ললেন—"তবু···"

—"আর তবু নেই",—দৃঢ়স্বরে রতীনবাবু ব'ললেন—"ঐ ত্র্যহস্পর্শের নিষেধের ভেতরই আমাদের অভিযানকে সফল ক'রে তুলতে হবে। কালই আমরা চ'লব।"

পাঁচ
এবার সুরু

সকালে সোমেনের যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, আকাশে তখন সূর্য্যির চিহ্নও নেই। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে অস্পষ্ট ভোরের আলো সবে মাত্র উঁকি দিচ্ছে। টাঙানো ক্লক-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে দেখ্‌লে—পাঁচটা কুড়ি।

সকালের বেড্‌-টি সারা হ'তেই সোমেন দু'-একটা টুকিটাকি দরকারী জিনিষের দিকে মনোনিবেশ ক'রলে। লোহার বাঁকা হুক্‌, কপিকল-বসানো মোটা রোপ্‌, আইডিন্‌, থার্ম্মোফ্লাস্ক্‌ তো না নিলেই নয়। তাছাড়া চায়ের সরঞ্জাম···

মলিনা এসে জানালো—"সোমেন দা, রতীনবাবু এসেছেন তৈরি হ'য়ে। বেশী রোদ উঠার আগেই আমাদের তৈরি হ'তে হবে।"

মণিদার ঘুম তখনও ভাঙেনি। মলিনা ডাকতেই ধড়্‌মড় ক'রে বিছানার উপরে উঠে ব'সে সাতঙ্কে জিজ্ঞেস ক'রলেন—"তা হ'লে সত্যিই যাবি, আজকে ?"

হাস্‌তে হাস্‌তে মলিনা ব'ললে—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তোমার এখনও সন্দেহ ? রতীনবাবু এসেছেন—এক্ষুণিই যে আমাদের ষ্টার্ট ক'রতে হবে !"

—"ও তাই নাকি ?"—ব'লে মণিদা চার কাপে চুমুক দিলেন।

বিলিতি পোষাকে সেজেগুজে ওরা যখন সবাই মলিনাদের মোটরে উঠ্‌লো তখন সূর্য্য পূব দিকে দেখা দিয়েছে। মলিনার বাবা প্রমথেশ বাবু ও তার মা ওদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন মোটরে।

রতীনবাবু ব'ললেন—"আমি নিজে এরোপ্লেন চালালেও আমার একজর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছে। বড় মাঠটায় তার চার্জ্জে প্লেন রেখে এসেছি—ওখান থেকে আমরা রওনা হব।"

পাশের সীটে সোমেন ব'সেছিলো। ধীরভাবে ব'ললে—"আমি বলি কী, আজকে আমরা খানিকদূরে এগিয়ে পথটা দেখে আসি। মণিদা ওরা শেষ পর্য্যন্ত ভরসা পাবে কি না কে জানে?"

—"আচ্ছা, দেখা যাক্"—ঈষৎ হেসে রতীনবাবু ব'ললেন।

মলিনাদের সিক্‌স্ সিলেণ্ডার গাড়ীটা তখন প্রায় মাঠের মুখে এসে গেছে। দূরে মাঠের ভেতরে দেখা যাচ্ছে রতীনবাবুর এরোপ্লেন—আশেপাশে কৌতূহলী জনতা ওটাকে নিরীক্ষণ ক'রছে।

মোটর থামিয়ে ওরা একে একে নেমে এলো। রতীনবাবু সবার আগে গিয়ে প্লেনটার কাছে দাঁড়াতেই কৌতূহলী জনতা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তাঁর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রতীনবাবুর গাঢ় নীল রঙের পোষাকের উপর তাঁর মাথার পাইলটী ক্যাপ দেখে তা'কে যেন কোন রকমেই বাঙালী ব'লে চেনা যায় না!

এরোপ্লেনের কামরার দরজা খুলে' মণিদা, মলিনা আর মহিম ভেতরে আশ্রয় নিলেন। সোমেন এল রতীনবাবুর পাশে।

সোমেনকে পাশে বসিয়ে রতীন মিটারে ষ্টার্ট দেখে নিলেন। তাঁর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রপেলার ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিতেই এরোপ্লেনটা দু' চাকায় ভর ক'রে ঝড়ের বেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে ক্রমে আকাশে উঠে গেল। সোজা উত্তর-পূব কোণ লক্ষ্য ক'রে তীরের বেগে প্লেন ছুটে চ'ল্‌লো···

তখন চোখের উপর ফুটে উঠ্‌লো ছোট্ট গৌহাটী সহরের ছবি,—যেন পটে আঁকা! ঘর-বাড়ীগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন

ছোটো ছোটো খেলার ঘর—সবুজ বনের ফাঁকে ফাঁকে অযত্নে সাজানো। কিন্তু সে দৃশ্য মুহূর্ত্তমাত্র! সহরের রেখা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধূসর পাথর আর ঘন-বিন্যস্ত গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল,—এরোপ্লেন বাতাস বিদীর্ণ ক'রে উড়ে চ'লল প্রবল বেগে, আর নীচের পাহাড় বন তার শব্দে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

মণিদা ইতিপূর্ব্বে যে প্লেনে ওঠেননি, তা নয়; কিন্তু অভ্যাসের মাত্রা খুব বেশী ছিল না। তাই পার্ব্বত্য দৃশ্য প্রথমটা খুব উপভোগ্য হ'লেও, শেষ পর্য্যন্ত সেটা স্থায়ী হ'ল না। হঠাৎ মাথার ভিতরটা কী রকম ক'রে উঠ্‌ল—নীচের পৃথিবী ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো মিলিয়ে, চোখের সামনে ঘূর্ণির মতো খানিকটা ধোঁয়া যেন ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিলে!

কিন্তু দুর্গতি ওই পর্য্যন্ত হ'লেও বা কথা! 'এয়ার সিক্‌নেস্‌' (বায়ুপীড়া) যা'কে বলে, তিনি প'ড়ে গেলেন তারই কবলে। পেটের ভেতরে কেমন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল, তারপরেই সুরু হ'য়ে গেল বমি!

মণিদার অবস্থা বুঝতে ওদের বিলম্ব হয়নি, কাজেই রতীন-বাবু প্লেনের মুখ ফেরালেন। একটু নীচের দিকে হেলে প্লেন গোঁ ধ'রে ছুটে চল্লো···

রতীনবাবু চিন্তিত ভাবে ব'ললেন, "তাই তো সোমেন, কী করা যায়? যে জায়গা নীচে দেখ্‌ছ, তা'তে প্লেন নামানো মানে এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাওয়া। এরোপ্লেনের ভাঙ্গা লোহা আর কাচের কয়েকটা টুক্‌রো ছাড়া কেউ কোনদিন কিছু খুজে পাবে না।"

সোমেন আগে প্লেনে যথেষ্ট উঠ্‌লেও পাইলটের বেশে এই প্রথম। তারও কানে হাওয়া-ঢাকা টুপি। চিন্তিত সুরে

ব'ললে, "কিন্তু এ রোগের প্রতিকার ক'রবার মতো কোন প্রক্রিয়া কি আপনাদের নেই ?"

কিন্তু প্রক্রিয়া আর বিশেষ কিছু ক'রতে হ'লো না। আস্তে আস্তে বাতাসের ছোঁয়ায় মণিদা আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠ্‌লেন।

রতীনবাবু জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, "হ্যালো মিহির, এখন কেমন বোধ ক'রছ ?"

মণিদার ক্ষীণ কণ্ঠের সাড়া শুনা গেল, "একটু ভালো।"

সুহৃদ ব'ললে—"তবুও ভালো, আপনার অবস্থা দেখে আমরা যে কী রকম ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলুম, তা আর ব'লবার নয়। এমন জায়গা এটা…"

ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ বের ক'রে মহিম মণিদার মুখের কাছে ধরলো। সেটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে মণিদা ধীরে জিজ্ঞেস ক'রলেন—"এটা কোন্ জায়গা, সুহৃদ ?"

জবাবটা এলো বাইরে থেকে—সোমেনের গলা। চেঁচিয়ে ব'ললে—"খাসিয়া পাহাড় আমরা ছাড়িয়ে এসেছি, মণিদা ! কিন্তু কোন হিংস্র জানোয়ার বা মানুষের সন্ধান পাচ্ছি না। অভিযানটা দেখ্‌ছি ব্যর্থ হ'তে চললো। খালি বন আর জঙ্গল… ।"

রতীনবাবু সামনের লেন্‌স্‌টা এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখে নিচ্ছেন। তাঁর সামনে একটা ফানেলের মতো চোঙা। ব্যঙ্গ-স্বরে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—"ব্রেভো, চোখে বোধ হয় এখন সরষে ফুল দেখ্‌ছ, না মিহির ?"

অপ্রতিভ ভাবে মণিদা ব'ললেন—"না, তবে হঠাৎ যেন মাথাটা কেমন ঘুরে উঠ্‌লো ! তখনই না বলেছিলুম আজকে যাত্রা নাস্তি, ত্র্যহস্পর্শ দোষ…"

হাস্‌তে হাস্‌তে রতীনবাবু বললেন—"হ্যাঁ, আমরাও তাই ভাবছিলুম এবং শেষে ঠিক্ই ক'রলুম যে, চলন্ত প্লেন থেকে

প্যারাসুট দিয়ে লাফিয়ে নেমে গিয়ে তোমার একবার যাত্রা বদল ক'রে আসা দরকার, চেষ্টা ক'রবে নাকি একবার ?"

সোৎসুক ভাবে সোমেন হঠাৎ ব'ললে—"রতীনবাবু !"

চমকে উঠে রতীনবাবু সেদিকে দৃষ্টি নিবেশ করলেন। দূরে নিবিড় সবুজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে ছোট্ট একফালি সাদা জলের স্রোত যে দিকে তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে গেছে, তারই ফাঁকে একটা পরিষ্কার নিরিবিলি জায়গা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমতল বোধ হয়, আশেপাশে গাছপালা নিতান্ত অপ্রচুর।

সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে রতীনবাবু ব'ললেন—"বোধ হয় নামা যেতে পারে।"

সোমেন ব'ললে—"চেষ্টা ক'রে দেখুন।"

কিন্তু প্লেন নামানো সহজ হ'ল না। জায়গাটা উপর থেকে সমতল দেখালেও উঁচু-নীচু পাথরের ঢিবি চারিদিকে ছড়ানো এবং প্লেনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় সে সম্ভাবনাটুকু স্বীকার না করলেও চলে না।

রতীন চিন্তিত মুখে ব'ললেন—"দেখা যাক্।"

উড়ন্ত কলের পাখীটা বার কয়েক দ্বিধাভরে চক্র দিয়ে মাঠের 'পরে নেমেই প'ড়ল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে প্লেনটা কেঁপে উঠ্‌ল, তারপরে একধারে প'ড়ল কাৎ হ'য়ে।

আরোহীদের সমবেত একটা আর্ত্ত-চীৎকারে চারিদিক্ কেঁপে উঠ্‌লো।

কিন্তু বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি কারো। রতীনবাবুই প্রথমে লাফিয়ে প'ড়লেন, ব'ললেন,—"পাথরে চোট্ লেগে একটা হুইল ভেঙেছে।"

ছয়
শয়তানের চোখ

যে জায়গায় তারা এসে নাম্‌লো, সে জায়গাটা পার্ব্বত্য-অঞ্চল হ'লেও পাহাড়ের শ্রেণী সেখান থেকে ছিলো কিছু দূরে। দূরে পাহাড়ের উঁচু নিবিড় সবুজ জঙ্গল যেখানে মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে, তারই গা বেয়ে ছোট্ট পার্ব্বত্য নদীটি কুলুকুলু ক'রে ব'য়ে চলেছে। নদীতটের প্রশস্ত বেলাভূমি পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু পাহাড়ের ওপর ওদের প্লেনটা একদিকে ঈষৎ কাৎ হ'য়ে পড়ে র'য়েছে—রতীনবাবু সেটা মেরামতের কাজে ব্যস্ত।

ভাঙা জায়গার উপর ঝুঁকে' প'ড়ে সোমেন জিজ্ঞেস করলে—"ক্ষতি কি গুরুতর ?"

হাত গুটিয়ে বালুর উপরে হাঁটু গেড়ে' রতীন পরীক্ষা করছিলেন। চিন্তিত স্বরে ব'ল্‌লেন, "না, সে রকম বিশেষ কিছু নয়, তবে আরেকটু হলেই বিপদের কথা ছিল।"

সুহৃদ এসে জানালো, রান্নার কাজে তা'রা যথেষ্ট এগিয়ে এসেছে। ইক্‌মিক্ কুকার, ষ্টোভে চড়িয়ে দেওয়া সারা—আয়োজনও নেহাৎ কম নয়। ডিম, মাংস······"

সোল্লাসে সোমেন জানালো—"চমৎকার !"

রতীনবাবু একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"সবাইকে একটু সাবধান থাকতে ব'লে দাও সোমেন, জায়গাটা কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। রান্নার কাজ যত শীঘ্র সারা হয়, ততই ভালো। বিকেলের আগেই আমাদের এ জায়গাটা ছাড়তে হ'বে।"

সোমেন ব'ললে,—সুহৃদ, তুমি বন্দুকগুলো 'রেডি' ক'রে এদিকে নিয়ে এসো। রিভল্‌ভার ক'টার একটা মণিদাকে দিয়ো।"

কথাটা ক্ষীণভাবে কাণে যেতেই মণিদা ব্যস্ত পদে এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল একটা আতঙ্কের ছায়া। চিন্তিত সুরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"ব্যাপার কি সোমেন ?"

—"ব্যাপারটা যে কী, তা' তো তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পারছ" —ঈষৎ হেসে রতীনবাবু ব'ল্‌লেন—"এসেছ বন-জঙ্গলে ঘুরতে, পদে পদে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন, সংগ্রাম রয়েছে ; তা তো বলাই বাহুল্য। উপস্থিত এ স্থানটা নিরাপদ নয়, কেননা······"

মণিদা চিন্তিত সুরে ব'ললেন—"তাই তো, কী ফ্যাসাদ ! আমি বলি কি, চলো, এখান থেকে একদম পালিয়ে যাই,— তারপর আরো লোকজন নিয়ে না হয় শিকারে আসা যাবে। দেখো, এ রকম দুঃসাহসকে আমল দেওয়া আমি মোটেই ভালো মনে ক'রছিনে।"

রতীনবাবু উষ্ণ হ'য়ে ব'ললেন—"কী জ্বালা। তোমাকে নিয়ে একেবারে নিরুপায় দেখছি !"

সোমেন ব'ললে—"ভয় কী মণিদা ! আমরা এতজন মানুষ আছি ; তা' ছাড়া, গুলি-বারুদ বন্দুক—একেবারে নিঃস্ব তো আর নই ! নিন, আপনি বরং একটা রিভল্‌ভার······"

মণিদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে টোটাভরা রিভল্‌ভারটা নিলেন।

হঠাৎ একটা কর্কশ হিস্‌ হিস্‌ শব্দে সবাই চম্‌কে উঠে উপরের দিকে তাকালো। তা'রা দেখলো—সারা আকাশটা তোলপাড় ক'রে একদল কালো পাখী তা'দের লম্বা গলা দুলিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। পাখীর অবিরাম পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দ

শোনাচ্ছে কেমন ভয়াবহ,—যেন কোন্ সর্ব্বনেশে বাঁশীর একটানা স্থর !

রতীনবাবু এক লাফে চমকে উঠে ব'ললেন,—"সোমেন, বী রেডি !"

ততোধিক বিস্ময়ে সোমেন ব'ললে, "কী ব্যাপার ?"

রতীনবাবু তেমনি ভাবেই ব'ললেন, "ঐ যে এক দল অদ্ভুত পাখী উড়ে গেল, ওদের ইতিহাস তুমি জানো না। যেখানে আমরা এসেছি, খুব শীগ্গিরই এক ভয়ানক জানোয়ারের দেখা মিলবে। সভ্য মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও এদের মতো ভয়াবহ প্রাণী যে দুর্ল্লভ, তা' আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি। এ জানোয়ারের নাম হ'চ্ছে—সাইড্রোপিসাস্ !!"

সোমেন শশব্যস্তে ব'ললে, "তা' হ'লে······"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে অদ্ভুত প্রশান্ত স্থরে রতীনবাবু ব'ল্লেন, "এই যে অদ্ভুত পাখী দেখলে, এরা সাধারণতঃ দল বেঁধে থাকে অষ্ট্রেলিয়ার নিবিড় অরণ্যে। গতবার শিকারে বেরিয়ে আমি এদের প্রথম আবিষ্কার করি এদেশে। এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, সাইড্রোপিসাস্ কোনোদিন এশিয়ার বুকে বিচরণ ক'রবে। মনে আছে, আসার দিন ট্রেনে তোমাকে কোন্ জানোয়ারের কথা ব'লেছিলাম ?"

অত্যধিক আতঙ্কে মণিদা'র রিভল্ভার-স্থদ্ধ হাতটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্তে লাগল। অস্ফুটস্বরে তিনি ব'ললেন, "আমি এখনো ব'ল্ছি রতীন, পালাও, আর গোঁয়ার্তুমিতে কাজ নেই—"

আতঙ্কের চেয়ে বিস্ময়টাই হ'য়েছিল রতীনবাবুর বেশী। মণিদা'র কথা কাণে না তুলেই ঠিক তেম্নি স্থির অথচ দৃঢ় স্বরে ব'ললেন, "তুমি জানো না সোমেন, এদের ধর্ম্ম হ'চ্ছে ক্রমাগত

ঐ সর্ব্বনেশে জানোয়ারের পেছনে ধাওয়া করা। অথচ আশ্চর্য্য, এদের মৃত্যু হ'চ্ছে একমাত্র ওদেরই হাতে।"

মলিনা ইতস্ততঃ ভাবে ব'ললে, "কিন্তু এখন ফিরে যাওয়াটা কী……"

দৃঢ় উত্তেজিত স্বরে সুহৃদ ব'ললে, "সম্পূর্ণ অসম্ভব। জানোয়ারের এত কাছে এসেও যদি তা'র দেখা না পাই, তা' হ'লে জানব অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ।"

হাতের বন্দুকটায় একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সোমেন ব'ললে, "হাঁ, নিশ্চয়ই। এশিয়ার লোকদের বাহুবল যে কারুর চাইতে এতটুকুও কম নয়, একথা না বুঝিয়ে আমরা ছাড়ব না।"

রতীনবাবু হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, "এগারোটা পঁচিশ। এই পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সব সেরে' নিতে হ'বে।"

হঠাৎ একটা বিকট চীৎকারে ওরা চম্‌কে দেখলে, মহিম নদীর একান্ত কূলে বালুর উপরে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা'র চোখে-মুখে কী এক আতঙ্কের ছায়া! মুহূর্ত্তে সোমেন সেদিকে ছুটে' চ'লল……

—'গুড়ুম্! গুম্!—

সোমেনের বন্দুকের মুখে খানিকটা ধোঁয়া,—একটু আগুনের আভাষও—

ওরা সকলে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখলে, সোমেনের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে বালুর উপরে প্রকাণ্ড একটা কুমীর অনড় হ'য়ে প'ড়ে,—শুধু লেজের দিক্‌টা থেকে থেকে উঠ্‌ছে ছট্‌ফটিয়ে। লাল টক্‌টকে রক্তে সে জায়গাটা রাঙানো—

সোমেনের পিঠ চাপড়ে রতীন ব'ললেন, "চমৎকার! একেবারে স্টোন্ ডেড্,—এ রকম পরিষ্কার হাত তোমার, তা

তো জানতাম না! চোখ দু'টো নষ্ট হ'য়ে গেছে, ঠিক্ বিঁধেছে কপালের উপরে—"

সোমেন ব'ললে, "এসে দেখি মহিমকে তাড়া ক'রেছে, আর একটু দেরী করলেই নিয়েছিল!" মহিম কম্পিত গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে, "কী ভয়ানক! আমি আগে ভাবতেও পারিনি! নিশ্চিন্ত মনে জল নিতে এসেছি, হঠাৎ দেখি এক মূর্ত্তি! কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একেবারেই এলো বে-পরোয়া ছুটে! দাদাবাবুর আসতে আর একটু দেরী হ'লেই—"

"সে যাক্"—রতীনবাবু বাধা দিয়ে ব'ললেন, "জলটলের দিকে একটু সাবধানে যেয়ো। শুধু কুমীর কেন, এমন সব জন্তুরও দেখা পেতে পারো, যা'রা শত বন্দুকের গুলি অগ্রাহ্য ক'রেও তোমাকে রান্নাঘর পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রতে কসুর ক'রবে না।"

মহিম সভয়ে ব'ললে, "সর্ব্বনাশ! এই নাকে খৎ দিচ্ছি, আর কখনো ওমুখো হ'বো না।"

সোমেন ব'ললে, "যাওয়া যাক্ রতীনবাবু, আমাদের খাবার তৈরি। বেলাও কম হয়নি…"

খাওয়া সেরে তারা যখন সাজ-পোষাক পরতে ব্যস্ত, তখন বেলা প্রায় বারোটা। টুকিটাকি জিনিষগুলো প্লেনের হোল্‌ডের ভেতরে ঢোকানো হ'চ্ছে—ওগুলো মহিমের চার্জ্জে। ঠিক হ'লো ওরা পাহাড়ের উপর থেকে ঘুরে আসবে, পাখী বা হরিণের মাংস সংগ্রহের চেষ্টাও বাদ যাবে না। বেলা চারটের ভিতরে ওরা ফিরে এসে প্লেন ছাড়বে।

সবারই শিকারে বে'র হ'বার পোষাক পরা, সবারই হাতে বন্দুক। কেবল মিস্ সেনের কাছে ছ'ঘরা রিভল্‌ভার,—অতিরিক্তের ভেতরে সোমেন ও রতীনবাবুর কোমরে গোঁজা দু'টো চক্‌চকে ছোরা…।

ওরা দেখে, নদী তীরে বালুর উপরে প্রকাণ্ড একটা কুমীর।

প্রচুর টোটাভরা বেল্‌টটা আড়াআড়ি ভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সোমেন ব'ললে,"তা' হ'লে তুমি থাকো মহিম, চুপটি ক'রে কামরার ভেতরে ব'সে। একটা বন্দুক তো রইলই, কিচ্ছু ভয় নেই, দিনের ব্যাপার···"

প্রবল আতঙ্কে মহিম প্রায় কেঁদে ফেললে, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ব'ললে, "দোহাই দাদাবাবু, আমাকে মেরো না। আমি এখানে থাকলে নিশ্চয়ই ম'রে যাবো···।"

তা'র কান্না দেখে, মণিদা এগিয়ে এলেন। ব্যথিতভাবে ব'ললেন, "তা' নেহাৎ মিথ্যে বলেনি ও। এখানে একজন থাকা অবশ্য দরকার, তবে একার পক্ষে···"

ইঙ্গিতটা রতীন বুঝলেন, হাসতে হাসতে ব'ললেন, "বেশ, তাই হ'বে। মিহির, তুমিও বরং থেকে' যাও ওর পাহারায়। ভয় কী, যদি প্রয়োজন বোধ করো, গুলি-গোলা ইচ্ছে মতো ব্যবহার কোরো।"

মণিদার তা'তে বিশেষ আপত্তি নেই—বোঝা গেল। মাথা চুলকাতে চুলকাতে ব'ললেন, "তাই তো, আমার ইচ্ছা ছিল একবার শিকারে যাওয়া,—শিকারে যাওয়া আমার ভারী সখ, জানোই তো? কিন্তু কি করি, তোমরা আমাকে···হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারো, ফিরে' আসবার চেস্টা কোরো, ভুলো না যেন।"

রতীন ব'ললেন—"হ্যাঁ।"

পাহাড়ের পথ ধ'রে ওরা চ'লল। নিবিড় ঘন কালো মেঘের মতো দূরে খাসিয়া পাহাড়ের শ্রেণী রয়েছে ওদের একপাশে। পাহাড়ে নদীটার স্রোত খুবই,—যেমন হ'য়ে থাকে।

—'গুড়ুম্!'—সুহৃদের বন্দুকটা হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌ল।

একসঙ্গে সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল। সোমেন সত্রাসে ব'ললে, "কী?"

মুখের উত্তর পাওয়ার আগেই ওরা বুঝতে পারলে কী বিপদ্ ঘনিয়ে এসেছে কাছে! পাহাড়ের উপর থেকে একটা উন্মত্ত লোমবহুল ভালুক তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের লক্ষ্য ক'রে। তা'র চলার সাথে সাথে পাথরগুলো এদিক্-ওদিক্ ছিট্‌কে পড়্‌ছে, কিন্তু সে দুর্ব্বার গতির সাম্‌নে ওসব নিতান্তই তুচ্ছ!

তা'র ক্রুদ্ধ চোখ দু'টো থেকে যেন ক্রমাগত আগুনের গোলা ছিট্‌কে পড়্‌ছে! কী ভীষণ সে প্রখর জ্বলন্ত দৃষ্টি!

রতীনবাবু মরিয়া হ'য়ে ব'ললেন, "থ্রি অ্যাট্ এ টাইম্—কুইক্ (তিন জনে একসঙ্গে—জল্‌দি)!"

ওদের তিন্‌টে বন্দুক একসঙ্গে বিরাট গর্জ্জন ক'রে চারিদিক্ কাঁপিয়ে তুললো। ভালুকটা ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে এসে লুটিয়ে পড়লো।: একটা গুলি তার কপাল ফুটো ক'রে দিয়েছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোমেন ব'ললে—"এরকম ছেলে-খেলা ক'রো না সুহৃদ, বিপদে পড়বে। অতদূর থেকে গুলি করা মানে ওদের ক্ষেপিয়ে তোলা।"

মলিনা তখনও ধাক্কাটা যেন সাম্‌লাতে পারেনি। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ব'ললে—"উঃ কী ভয়ানক!"

মরা ভালুকটার মুখটা ফাঁক ক'রে জুতোর ডগা দিয়ে তার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো ঘ'ষতে ঘ'ষতে রতীনবাবু ব'ললেন—"বেচারা! কিন্তু কথা হ'চ্ছে, আমাদের এ স্থান ত্যাগ করা দরকার। দেরী হ'লে বিপদের সম্ভাবনা।"

সোমেন হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—"মানে এর সঙ্গী ভালুকটা এসে অনতিবিলম্বে প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ ক'রবে—এই তো?"

—"হ্যাঁ, সেটা অসম্ভব নয়; তা ছাড়া, অনেক হিংস্র জানোয়ারের লোলুপ দৃষ্টিটাও র'য়েছে এখানে; নেহাৎ চক্ষু-লজ্জার জন্যেই আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে র'য়েছে। কিন্তু লোভটা যদি চরমে ওঠে, তাহ'লেই মুস্কিল! একেবারে সশরীরে আবির্ভূত হ'য়ে প'ড়বে।"

দূরে পাহাড়ের মাথায় কোন হিংস্র জন্তুর অদ্ভুত এক গর্জ্জন শোনা গেল। ওরা বুঝলে—যা ভাবা তাই!

রতীন ব'ল্‌লেন,—"চলো, এগিয়ে চলো।"

দলের আগে রতীনবাবু, পেছনে সোমেন—মাঝখানে আর সব। কিছুদূর এগিয়ে ছোট্ট পথটা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেছে—যেন দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলপথ।

দুপুরের রোদ্ তখন নির্দ্দয়ভাবে এসে পাহাড়ের বুকে বিঁধ্‌ছে। সাম্‌নের একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী-গাছের ছায়ায় পাথরের উপর দিয়ে ওরা চ'লেছে! আরো কিছুদূর এগিয়ে পথটা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় একটানা গহন বন, নিবিড় নিথর। ছোট-বড় গাছ আর জঙ্গলে আচ্ছন্ন বনটার ভিতরে সূর্য্যের আলোককেও পথ খুঁজতে বেগ পেতে হয়।

রতীন থামলেন। একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললেন, "এই জঙ্গলটা হ'চ্ছে প্রায় পঁচিশ মাইল জায়গা নিয়ে। ব'লতে কী—খাসিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিভীষিকার স্থান হচ্ছে এটা!"

—"তা হো'ক"—সোমেন ব'ললে, "কিছুদূর বরং এগিয়ে দে'খে আসি। তোমার কী মত, মলিনা?"

অস্ফুটস্বরে মলিনা ব'ললে—'হুঁ!"

—"আচ্ছা চলো তাহ'লে—কিন্তু খুব সাবধান! বন্দুকটা সব সময় রেডি রাখ্‌বে, দরকার হ'লে আর কথা নেই…"

আতঙ্কে সুহৃদ ব'ললো—"বাপ্‌রে, ভেতরে কী অন্ধকার! তবু ভাগ্যি টর্চ্চটা এনেছিলেন!"

টর্চ্চের আলো ফেলে' ওরা এগিয়ে চ'ললো। সাম্‌নে কিছু দূরে দু'এক জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ দেখা যায়। আলোর সেখানে প্রয়োজন নেই। সেখান থেকেই বনটা যেন অগভীর ও পাৎলা হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ হেসে উঠে রতীনবাবু ব'ললেন,—"মিহির থাক্‌লে ভয়ে এতক্ষণ হয়তো কেঁদেই ফেলতো—নইলে বা ফিট্‌!"

মুখ টিপে হেসে মলিনা ব'ললে—"মণিদা'র ভারী ভয়, তবু নিজের জারিজুরি দেখাতে ছাড়ে না।"

কথা শেষ হবার আগেই অদূরে বুনো-হাতীর আবির্ভাব ওরা বেশ বুঝতে পারলো। ওদের একপাশে ডাল-ভাঙার শব্দ এবং হাতীর গর্জ্জন শোনা যেতেই চকিত কণ্ঠে রতীন ব'ললেন—"চট্‌পট্‌ এগিয়ে চলো!"

জায়গাটা জলা—কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে বোঝা গেল। কর্দ্দমাক্ত পিছল পথে পা টিপে' সাবধানে ওরা এগিয়ে চ'লেছে…

হঠাৎ! একটা দুর্দ্দান্ত হাতী আক্রোশে ফোঁস ফোঁস ক'রে ওদের সামনে এসে' উপস্থিত! এই গভীর জঙ্গলে মানুষের উপস্থিতি সে আশা করেনি—ওদের একান্ত সম্মুখে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে রাগে শুঁড়টা দোলাতে লাগ্‌লো…

রতীন চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "সাবধান, কেউ গুলি ক'রো না…"

'গুড়ুম্‌ গুম্‌!!' রতীনবাবুর কথা শেষ হবার আগেই সোমেনের বন্দুক গর্জ্জে উঠ্‌লো। কিন্তু ফল হ'লো ঠিক

বিপরীত। গুলি লাগলো গিয়ে হাতীর শুঁড়ের ঠিক মাঝখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আকৃতি যেরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌লো, তা বলা কঠিন।

বিকট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতীটা বে-পরোয়া ভাবে ওদের দিকে ছুটে এলো। তার চলার চাপে আশে পাশের ডালপালার মড়্‌মড়্ শব্দের ভেতরে সমস্ত বনটা যেন থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। এবার বুঝি রক্ষা নেই!

রতীনবাবুর আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল—"সবাই গাছে উঠে পড়—"

এক মুহূর্ত্তে সুহৃদ মলিনার হাত ধ'রে একটানে একটা শাল গাছের উপর তা'কে টেনে নিল। রতীনবাবুও ততক্ষণে আর একটা গাছে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এতটা ঠিক্ হ'য়ে উঠ্‌লো না সোমেনের পক্ষে। হাতের বন্দুকটা সামলিয়ে রেখে একটা গাছের মোটা ডাল ধ'রতেই—

হাতীটা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—তার সব রাগ সোমেনের উপরে। তার মূলোর মতো দাঁত দুটো বে'য়ে গড়িয়ে প'ড়ছে রক্তের ধারা। রক্তের বন্যায় সমস্ত মুখটা দেখাচ্ছে বীভৎস রকমের। একটা অদ্ভুত চীৎকার ক'রে সেই যে সোমেনের পেছনে ছুটে চ'ললো—আর তা'কে শেষ না ক'রে বুঝি ছাড়বে না। তার গর্জ্জন আর হুঙ্কারে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠ্‌ছে। সোমেন ডাল্‌টা ঠিকমত ধ'রবার আগেই শুঁড় দিয়ে তা'কে জড়িয়ে নিয়ে উন্মাদের মতো আবার ছুটে চললো···

রতীন প্রমাদ গণলেন। আতঙ্কে মলিনা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"সোমেন দা!"

মুহূর্ত্তে একলাফে গাছ থেকে নীচে প'ড়ে রতীন মরিয়া হ'য়ে ছুটলেন। সেই অন্ধকার জঙ্গল—তার ভেতরে দুর্দ্দান্ত এক হাতীর পেছনে ধাওয়া ক'রেছেন তিনি। হাতীকে তিনি ধ'রে ফেল্লেন—কিন্তু বন্দুক!

আব্‌ছা অন্ধকারে হাতে ঠেক্‌লো খাপে-গোঁজা রিভল্‌ভারের গোড়ার দিক্‌টা। দৃঢ়হাতে সেটাকে ধ'রে আবার তিনি ছুটে চ'ললেন···

'গুড়ুম্ গুম্ গুম্!!' একসঙ্গে তিন্‌টে গুলি হাতীর দু'পায়ে বিঁধে গেছে। সমস্ত স্থানটা বারুদের গন্ধে ভ'রে গেছে। একটা তীব্র আর্ত্ত চীৎকার ক'রে মুহূর্ত্তে হাতীটা সোমেনকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো···

সোমেনের শরীরটা ঘুরতে ঘুরতে একটা ছোট্ট ঝোপের উপর এসে পড়লো। কিন্তু হাতীটা কাবু হ'য়ে প'ড়লেও তার আততায়ীকে সহজে ছাড়বে না। তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে রতীনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে' চল্‌লো মরিয়া হ'য়ে।

তখন সেই বনের ভিতর সুরু হয়ে গেল রানিং রেস্। রতীনবাবু আগে, আর পেছনে সেই দুর্দ্দান্ত আহত হাতীটা ছুট্‌ছে বে-পরোয়া ভাবে। প্রতিশোধ সে আজ না নিয়েই বুঝি ছাড়বে না!

আবার সেই গর্জ্জন! সুহৃদের হাতের বন্দুকটার দুই নল দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া উদ্গিরণ ক'র্‌ছে। সেই ক্ষিপ্ত হাতীর শরীরটা মুহূর্ত্তে হুড়মুড় ক'রে যেন ভেঙ্গে প'ড়লো! সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে তার বিরাট দেহটা কাৎ হ'য়ে মাটিতে এলিয়ে প'ড়লো। তার কপালের উপর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে নেমে আস্‌ছে টাট্‌কা রক্তের ধারা!

বন্দুকটা হাতে নিয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সুহৃদ। খুসীর আনন্দে তার মুখখানা ভরপূর।

কিন্তু সোমেন ?

একটা ছোট গাছের ডাল ধ'রে সোমেন নিজের দেহটাকে স্থির ক'রে নিলে। স্নায়বিক উত্তেজনায় তার হাত দু'টো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সে এই অবশ ভাবটাকে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কিন্তু কোন রকমেই রোধ ক'রতে পারছে না।

কিন্তু এ কি ? তার হাত এরকম অদ্ভুতভাবে কাঁপে কেন ? তার চোখের সামনে একসঙ্গে হাজার সর্ষে ফুল নেচে বেড়ায় কেন ?

শ্লথ হাত দু'টো ডাল থেকে খ'সে প'ড়তেই সোমেনের নির্ভরশীল দুর্ব্বল শরীরটা নীচে খ'সে প'ড়লো। নীচু ডাল, কাজেই আঘাতটাও গুরুতর নয়। পিছল্ জলা-জায়গার উপরে সোমেন দু' পায়ে ভর ক'রে দাঁড়ালো। তার শরীরটা তখনও কাঁপছে···

হঠাৎ! সোমেন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো—তার সামনে, কাছে, একান্ত কাছে জঙ্গলগুলোর ভেতরে ও-দু'টো কী ? জ্বল্‌জ্বলে দু'টো আগুনের গোলা যেন···স্থির অচঞ্চল! কী অদ্ভুত আকর্ষণী তেজ ওর! সোমেনের প্রত্যেক স্নায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন পঙ্গু হ'য়ে গেছে! দৃষ্টি তার স্থির—আতঙ্কের কোন ছায়াই সেখানে ফুটে' ওঠেনি!

আগুনের গোলা দু'টো ক্রমশঃই উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছে···। অদৃষ্ট কা'র কী কে জানে ?

সাত
বিভীষিকার মুলুক

কিন্তু ওটা কী?

কী সর্ব্বনাশা তেজই ওর! সোমেনের সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে এলো,—তার ক্লান্ত শরীরটা আবার তেম্‌নি জলা-মাটির বুকে এলিয়ে প'ড়লো। কিন্তু সেই অস্পষ্ট অনুভূতির ভেতরেও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছে একজোড়া জ্বল্‌জ্বলে চোখ আর একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা মুখ—ভিতরের দাঁতগুলো অস্বাভাবিক রকমের ধারালো···

শেষবারের মতো সোমেনের চোখ বুজে' এলো···

হঠাৎ! পৃথিবীটা কী তছ্‌নছ্‌ হ'য়ে গেল? মরবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সোমেনের মাথা খারাপ হ'য়ে গেল না কি?

ঠিক ওর কানের কাছেই একটা তীব্র চীৎকারে সমস্ত জঙ্গলটা কেঁপে উঠ্‌লো। বন-কাঁপানো সেই অদ্ভুত মাতামাতির ভিতরে একটা বন্দুকের গর্জ্জনে সোমেন সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লে। আবার সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হ'য়ে এলো; এক মুমূর্ষু প্রাণীর গোঙ্‌রাণির শব্দ ছাড়া চারিদিক্ একেবারে নিঝ্‌ঝুম্!

সেই ঝোপের ভিতর থেকে রতীনবাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁর চুলগুলো উস্কোখুস্কো, পোষাকটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে, এখানে ওখানে ছেঁড়া;—ময়লা আর কাদায় তার পেছন দিক্‌টা ভরা। রিভল্‌ভারের বাঁটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলে সোমেনের অচৈতন্য দেহটার উপরে তিনি ঝুঁকে প'ড়লেন, ডাকলেন্—"সোমেন!"

অর্থহীন বোবা-দৃষ্টি মেলে সোমেন রতীনবাবুর মুখের দিকে তাকালো—কিন্তু তার চোখ দু'টো পরক্ষণেই আবার বুজে এলো

নিস্তেজ ভাবে। ততক্ষণে সুহৃদরা সবাই এসে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছে। চিন্তিত স্বরে রতীন ব'ললেন,—"মুস্কিল হ'লো, সোমেনের জ্ঞান নেই, এখন কী করা যায় ?"

হঠাৎ !

ওরা সবাই একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌লো,—প্রলয়-কাণ্ড না কি ?

সেই গভীর নিস্তব্ধ জঙ্গলের ভিতর হঠাৎ শোনা গেল অসংখ্য কাড়া-নাকাড়ার একটানা একটা বিচিত্র শব্দ—যেম্‌নি অদ্ভুত, তেম্‌নি ভয়াবহ! সেই শব্দটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে—সমস্ত বনটা তারই প্রতিধ্বনিতে থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে !

পৃথিবীর কোন জানোয়ারের চীৎকার যে এমন অদ্ভুত রকমের হ'তে পারে, এ কেউ কল্পনাও করতে পারে না !—এবার ওদের বাঁচায় কা'র সাধ্য ?

মলিনা সুহৃদের একান্ত কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়ালো। চোখ বিস্ফারিত ক'রে সাতঙ্কে জিজ্ঞেস ক'রলো—"ব্যাপার কী রতীনবাবু ?"

রতীনবাবুর চোখ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে এলো। মুহূর্ত্তে সোমেনের অচৈতন্য শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"সোমেন !"

একটা অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দমাত্র শোনা গেল সোমেনের কাছ থেকে।

রতীনবাবু পেছন ফিরে ব'ললেন, "সর্ব্বনাশ ! সুহৃদ, তুমি মলিনার ভার নাও। সোমেনের জ্ঞান নেই—আমি কাঁধে ফেলে ওকে ছুটতে পারবো। আর এক মুহূর্ত্ত সময় নেই—পালাও,—যতদূরে চোখ যায় পালাও···। সাম্‌নে কিছু দেখ্‌লেও

থেম না—সোজা ছুটবে—অন্ততঃ দু'মাইল পথ এম্‌নি ভাবে। দৌড়োতে হ'বে…।"

কথা শেষ হ'বার আগেই রতীনবাবু সোমেনের নিস্তেজ দেহটা এক ঝাঁকিতে নিজের কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলেন। রিভল্‌ভারটা খাপের ভিতর নিয়ে টর্চ্চটা তিনি তুলে নিলেন।

সুহৃদ্ ব্যস্তভাবে ব'ললে—"তুমি কী নিজেই পারবে মলিনা, না আমি…"

—"না, না, আমিই পারবো। দৌড়োবার অভ্যেস্ আমার যথেষ্ট আছে।"

ওরা ছুটে চ'লেছে। সবার পায়ে হাঁটু অবধি বুট বাঁধা, ছোট-খাট ঝোপ-জঙ্গল ভেদ ক'রে ওরা ছুট্‌ছে। সবার আগে রতীন-বাবু টর্চ্চের আলোয় পথ দেখিয়ে চ'লেছেন—তার পেছনে মলিনা—সবার শেষে সুহৃদ,—তার হাতে দু'টো বন্দুক!

বনের পথ একটুও চলার উপযোগী নয়। কিন্তু যেখানে জীবন-সংশয়, সেখানে অসুবিধাটুকুকে আমল দিলে চলে না। একটু দূরে টর্চ্চের আলোয় একপাশে দেখা গেল একদল বেবুনের মত অদ্ভুত এক শ্রেণীর প্রাণী। টর্চ্চের আলোকে কোন এক মারাত্মক জানোয়ারের চোখ মনে ক'রেই বোধ হয় তারা প্রাণের ভয়ে যে যে-দিকে পারলো, পালিয়ে গেল। ওদের রাজ্যের ছোট-বড় কত অদ্ভুত ও বিচিত্র প্রাণীরই যে দেখা পাওয়া গেল, তার ইয়ত্তা নেই।

পেছনে তখনও সেই ঝম্‌ঝম্ শব্দটা শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর ভাবে। হঠাৎ রতীনবাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপরে কী মনে ক'রে ব্যস্তভাবে কয়েক পা পেছনে স'রে দাঁড়ালেন।

চমকে উঠে মলিনা ব'ললে—"কী ব্যাপার?"

রতীন ব'ললেন—"সর্ব্বনাশ! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ! ওই দেখ সাম্‌নে প'ড়ে রয়েছে,—হাত বারো লম্বা হবে হয়তো। এটা ঠিক্ শরীরের মাঝামাঝি। বুটের লোহার হুক গায়ে লাগতেই কেমন ন'ড়ে উঠ্‌লো! হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই-ই! ঐ দেখ পেটের দিক্‌টা! কী যেন খেয়েছে, নড়তে পার্‌ছে না বিশেষ। আপাততঃ ওর কাছ থেকে ভয় নেই।"

বন্দুকটা নামিয়ে ধ'রে সুহৃদ ব'ললে—"তা হ'লে কয়েকটা বসিয়ে দিই?"

—"পাগল হ'য়েছ?" ব্যস্তভাবে রতীন ব'ললেন, "সামান্য কয়েকটা বন্দুকের গুলিতে ওর কিছুই হবে না। তা ছাড়া, একবার চ'টে গেলে ফলও বিশেষ ভাল দাঁড়াবে না।"

ওটাকে ডিঙ্গিয়ে ওরা আবার চলা সুরু ক'রলো।

কিন্তু এবার বুঝি ওদের থামতেই হ'লো। সম্মুখে হাত তিরিশের বেশী এগোনো যায় না! সাম্‌নে হঠাৎ দেখা গেল অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা মস্ত গর্ত্ত—গভীরতা অন্ততঃ হাত তিরিশের কম নয়। জনহীন দুর্ভেদ্য এই জঙ্গলের ভিতর কা'রা এটা খনন ক'রেছে—এটাই আশ্চর্য্যের কথা!

রতীনবাবু থাম্‌লেন। হাতের টর্চ্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দিক্‌টা তিনি দেখে নিচ্ছেন। শ্রান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন,—"আবার ফ্যাসাদ! এখানে বুঝি থামতেই হ'লো—এ গর্ত্তটা খুব কম জায়গা নিয়ে নয়। দু'পার ঘুরে যেতে প্রায় মাইল তিনেকের কম হবে না। কিন্তু যে পরিমাণ আমরা পরিশ্রান্ত, তা'তে অতদূর পারব ভরসা হয় না।"

—"কিন্তু এখানে এ দীঘি কাট্‌লো কে?" বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে মলিনা প্রশ্ন ক'রলে।

উত্তর দিলেন রতীনবাবু, ব'ললেন,—"এর পেছনে একটা

ইতিহাস আছে। এটা হয়তো অসভ্য খাসিয়াদের কোন পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি। ওদের দেশে লোকালয়-বর্জ্জিত স্থানে এখনও এম্‌নি প্রকাণ্ড খাদ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বছরের বিশেষ একটা দিনে রাজ্যের সব মেয়ে-পুরুষ এখানে সমবেত হয়,—ওদের শয়তান দেবতার পূজোতে ওরা এখানে দেয় নরবলি। তাছাড়া ওদেশের অপরাধীকে ওরা প্রাণদণ্ড না দিয়ে এই সব গভীর গর্ত্তের ভিতর ঠেলে ফেলে দেয়। সাধারণতঃ ঐ দিনটি ছাড়া সব সময় এ স্থান এমনি নির্জ্জন অবস্থাতেই থাকে।"

টর্চ্চের আলো ফেলে ওরা পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। নীচটা এত গভীর যে, তাকালে মনে হয়, এখনই বুঝি প'ড়ে যেতে হবে! চারিদিকে বড় বড় এক শ্রেণীর ঘাস—একটা মানুষ তার ভেতরে অনায়াসে ডুবে থাকতে পারে। গর্ত্তের এক পাশে দেখা যায়, বাঁশের মাচার মতো একটা চালা—সামনে বাঁশের একটা হাড়িকাঠ। বোঝা গেল, ওদের পৈশাচিক লীলা সংঘটিত হয় ওখানে। চারিদিক্ গভীরভাবে নিস্তব্ধ,—আর সেই থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যে এ পরিস্থিতিটা দেখাচ্ছে একটা শয়তানের প্রেতপুরীর মতো।

মলিনা সুহৃদের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে কিসের আতঙ্কের ছায়া, এক মুহূর্ত্তও ওখানে থাকৃতে রাজী নয় সে।

সুহৃদ ব'ললে—"এখন উপায় ?"

সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রতীনবাবু চিন্তা ক'রতে থাকেন। বনের মধ্যে হিংস্র নিশাচরদের উন্মত্ত কোলাহল শোনা যাচ্ছে। একান্ত নিকটেই কয়েকটা হায়নার বীভৎস হাসি ওদের সবাইকে একসঙ্গে চম্‌কে দিলো। রতীন ব'ললেন,—"তাই তো—"

সুহৃদ ব'ললে—"কিন্তু তাঁবুতে ফিরে না গেলে কী ক'রে চলে? ওরা দু'জনেই যে ভীরু মানুষ,—কী ক'রে বসে, ঠিক নেই।"

রতীন দৃঢ়ভাবে ব'ললেন,—"সম্পূর্ণ অসম্ভব! বনের ভিতর পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা। সাম্‌নে রাতের অন্ধকার! এর মধ্যে এই অসংখ্য হিংস্র জানোয়ারদের কবল থেকে পথ উদ্ধার করতে যাওয়া আর মৃত্যু বরণ করা, একই কথা। এ রাতটা আমাদের এখানে কাটাতে হবে। ঐ শোন ওদের চীৎকার—আমরা যে ওদের হাতে বন্দী!"

মলিনার শরীরটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে—অত্যধিক ভয় পেয়েছে সে।

রতীন চিন্তিতভাবে ব'ললেন—"চিন্তার কথাই বটে! তবে কিছু ভরসার কথা—ওদের কাছে রয়েছে একটা রিভল্‌ভার আর দু'খানা ছোরা। আর কথা হ'চ্ছে প্লেনের কামরা আট্‌কে ভিতরে আশ্রয় নিলে কোন বিপদ্ না হবারই সম্ভাবনা।"

সুহৃদ ব'ললে,—"তা তো নিশ্চয়ই,—তবে ভয়টা যে কিছু বেশী, সেই তো ভয়ের কথা। একটা শিয়াল দেখে হয়তো বা দু'জনেরই ফিট্ হবে।"

রতীন ব'ললেন,—"থাক্ সে কথা। উপস্থিত এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা কাজের কথা তো নয়ই, তা'তে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট! চট্‌পট্ একটা গাছে উঠে পড়া দরকার। সামনের ঐ গাছটাতেই বরং উঠে পড়ি,—কী বলো?"

গাছটা অনেক উঁচু। পাহাড়ী গাছ,—পাতাগুলো কেমন অস্বাভাবিক রকমের বাঁকানো—আঁকা-বাঁকা যেন সাপের শরীর। সব চেয়ে কাছের ডালটা উঁচুতে মাটি থেকে প্রায় দশ-বারো হাতের কম নয়।

রতীনবাবুর কাঁধ থেকে মুখ তুলে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলে সোমেন রতীনবাবুর মুখের দিকে তাকালো। তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়—মূর্চ্ছার ঘোর তখনও কাটেনি, বেশ বোঝা গেল।

রতীন ডাক্‌লেন,—"সোমেন!"

কিন্তু সোমেনের কাছ থেকে কোন সাড়া এল না। 'ওয়াটার ক্যারিয়ার' থেকে জল নিয়ে সোমেনের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে চ'ললো চেতনা-সঞ্চারের পালা। কয়েক মিনিট পরে স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেলে সোমেন ব'ললে,—"হ্যাঁ, কোথায় আমরা?"

রতীন ব'ললেন—"ঠিক কোথায় এ কথা হয়তো ব'লতে পারবো না, তবে খাসিয়া পাহাড়ের জঙ্গল যে এটা—তা ঠিক্।"

রতীনবাবুর কাঁধে ভর ক'রে সোমেন উঠে দাঁড়ালো। হুক-লাগানো দড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে ওদের বিশেষ অসুবিধা হ'লো না। ঐ দড়িটার সাহায্যেই সোমেনকে ওরা অতি সহজেই টেনে উঠিয়ে নিলে।

গাছের ডালে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত বনের ভিতরে ক্রমশঃই অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে। বড় বড় গাছগুলো তাদের ঝাঁকড়া মাথাগুলো নিয়ে অন্ধকারের রহস্যের ভিতর ডুব দিতে চলেছে। দূরের বড় গভীর খাদটা ক্রমশঃই মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের চোখের সামনে থেকে। সমস্ত বনের ভিতর নেমে এলো রাতের মায়া—হিংস্র জানোয়ারদের কোলাহল-মুখর সে স্থান—এবার ওদেরই রাজত্ব!

সোমেনের একান্ত কাছে ব'সেছেন রতীনবাবু। তাঁর হাতে টর্চ্চের আলো,—সেটাকে জ্বেলে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন চারিদিকের অদ্ভুত দৃশ্যগুলি। সমস্ত বনটা অস্বাভাবিক

রকমের স্তব্ধ, আর সেই স্তব্ধতাকে বিদ্রূপ ক'রে অভিযানে বেরিয়েছে ক্ষুধিত নিশাচরের দল।

মৌন ভেঙ্গে অস্ফুটস্বরে সোমেন ব'ললে,—"কিন্তু কি দেখেছিলুম আমি? একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আর···"

রতীনবাবু চমকে উঠলেন যেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এলো, ব'ললেন,—"তোমাকে আবার ফিরে পাব ভাবিনি, সোমেন! যে চোখ দু'টোর কথা তুমি ব'লছ, তা একটা প্রকাণ্ড বাঘিনীর—যার লেজটাও হ'বে অন্ততঃ চার হাতের কম নয়। তোমাকে খুঁজতে এসে যা দেখলুম, তা ভাবতেও গা শিউরে উঠ্‌ছে। এসে দেখি,—পা টিপে টিপে তোমার দিকে এগোচ্ছে —অথচ তোমার জ্ঞানও প্রায় নেই, তা বুঝতে পারলুম। হাতে যদিও ছিল গুলিভরা রিভল্‌ভার, কিন্তু ও-অবস্থায় গুলি ক'রতে সাহস হ'লো না—তা'তে তোমারও জীবন-সংশয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অথচ আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রবার উপায় নেই। তোমার থেকে তার ব্যবধান তখন মাত্র দু' হাত কি তার চাইতেও কম! নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা কোমরের খাপে গোঁজা ছিলো বড় ধারালো ছোরাখানা। সেই অবস্থায় মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে গড়িয়ে এসে পেছন হ'তে ওখানা সবশুদ্ধ একেবারে বসিয়ে দিলুম তলপেটের ভিতরে। তারপরে—"

রতীনবাবু থামলেন। পরক্ষণেই একটা ঢোক গিলে আবার সুরু ক'রলেন,—"বাঘিনীটা এ রকম অতর্কিত আক্রমণ আশা করেনি। হঠাৎ চকিত হ'য়ে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। ছোরা-খানার বাঁট বেয়ে তখন টাট্‌কা তাজা রক্ত গড়িয়ে নাম্‌ছে। আমিও ছিলুম প্রস্তুত,—সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভল্‌ভারটার পর-

পর দু'বার ট্রিগার টিপলুম। তারপরে যা হ'লো নিশ্চয়ই দেখেছো,—এতবড় একটা আঘাত ও সহ্য ক'রতে না পেরে একেবারে ছিটকে প'ড়লো কয়েকহাত দূরে। একটা চোখ গিয়েছে ওর নষ্ট হ'য়ে,—এবং আর একটা গুলি হাঁ-করা মুখের ভিতর দিয়ে সোজা গলা ভেদ ক'রে গিয়েছে—"

প্রচুর খুসীর আনন্দে রতীনবাবু অট্টহাসি ক'রে উঠ্‌লেন। নিস্তব্ধ বনের মধ্যে পথ হারিয়ে সে হাসিটা কেমন অস্বাভাবিক ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো।

ওরা তেমনি ভাবে গাছের ডালে রয়েছে ব'সে। ওদের কারো চোখে ঘুমের এতটুকু আভাস নেই। উদ্‌গ্রীব ভাবে সেই গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাচ্ছে ওরা। ঘড়িতে রতীন দেখ্‌লেন, রাত প্রায় দেড়টা!

গাছের খুব নিকটেই হঠাৎ শোনা গেল একটা বিকট গর্জ্জন। টর্চ্চের আলোয় ওরা দেখ্‌লে একটা বুনো শূয়োর। চক্‌চকে সাদা দাঁতটা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে দেখাচ্ছে কেমন অদ্ভুত বীভৎস রকমের! চোখে তার ক্রুদ্ধ আগুনের ছটা,—ধারালো দাঁতের আগায় রক্তের চিহ্ন। এদিক্ ওদিক্ ছুটো-ছুটি ক'রে ক্রমশঃ চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে সে,—খণ্ডযুদ্ধ যে একচোট হ'য়ে গেছে কোথায়ও—একথা বেশ বোঝা যায়।

রতীন আলোটা নিবিয়ে দিলেন। হাতের কাছে গুলিভরা বন্দুক থাকতেও এতবড় একটা সুযোগের প্রতি ওরা বিন্দুমাত্র নজর দিলো না। অস্ত্রগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে ওরা নিঃশব্দে কিসের প্রতীক্ষা করছে,—উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে রয়েছে নিজেদের অদৃষ্টের দিকে।

রাত শেষ হ'তে তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকী। ঝিম্‌ঝিমে অমাবস্যার রাতের মতো বাইরে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, জনহীন

বিভীষিকার মুখে

দুর্ভেদ্য জঙ্গল, আর তারই ভেতরে অসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ার বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে। গাছের ডালে ওরা শক্ত ক'রে রেখেছে নিজেদের বেঁধে। কিন্তু তবুও ওরা আজ বিশ্বাস করতে পারছে না নিজেদের অদৃষ্টকে।

কাল্‌কের দিনের সূর্য্যের দেখা কী ওরা পাবে ?

আট
একটি রাত

অন্ধকার অরণ্য আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছে…

মৃত্যুর মতো পুঞ্জিত রাশি রাশি আঁধারের কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই, যেন একটা দিগন্ত-প্রসারিত প্রেতপুরী। বাতাস বইছে না,—সেও বোধ করি ভয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে, নড়্‌ছে না গাছের একটি পাতা পর্য্যন্ত। গাছের উপরে ওরা শক্ত হ'য়ে ডাল আঁকড়ে ধ'রে সেই অদ্ভুত বিভীষিকার সঙ্গে কম্পিত বুকে সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছে। ওদের বুকের স্পন্দন চলেছে যেন হাতুড়ির তালে তালে, তার শব্দ বাইরেও শোনা যায় বুঝি! একটু আগেও ঝিঁ ঝিঁ ডাক্‌ছিলো—দূরে কোথা থেকে আস্‌ছিল শেয়ালের চীৎকার—কিন্তু, এখন, এখন,—

চারিদিকে নিস্তব্ধ প্রতীক্ষা,—যেন প্রলয় হবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত!

দূরে সেই ব্যাণ্ড বাজছে—যেন যমদূতেরা এক সঙ্গে তাদের একশো কাড়া-নাকাড়ায় ঘা দিয়েছে। খাসিয়া পাহাড়ের দিকে দিগন্ত-প্রসারিত কালো কালো পাষাণ চূড়োগুলো তার শব্দে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো—

—'ঝট্‌-পট্‌-ঝট্‌'—

যেন একশ' বাদুড় একসঙ্গে পাখা সাপ্‌টে উড়ে আস্‌ছে—এম্‌নি শব্দ! সে পাখার শব্দে, আর তার বাতাসে গাছপালার ডাল-পাতাগুলো একসঙ্গে শাঁই শাঁই ক'রে উঠ্‌লো—ঝড় আস্‌ছে নাকি?

কিন্তু আকাশে মেঘ নাই,—মড়ার মতো সাদা জমিটাতে অসংখ্য পাণ্ডুর তারা,—আতঙ্কে নিষ্প্রাণ! এই ঝড় বয়ে আন্‌ছে কে?—

—কে আস্‌ছে এই প্রলয়-মূর্ত্তি আগন্তুক ?

পলকের মধ্যে সকলের মনে বিদ্যুতের মতো একটা সুতীব্র ঝলক দিয়ে গেলো—কিন্তু এতো সাইক্লোপিসাস্ নয়—এ আর কোন প্রাণী !

রতীনবাবু অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললেন, "সব বন্দুক রেডি ক'রে নাও —সামনে আমাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম,—ফল কী হবে কে জানে ?"

একটা চীৎকার-ধ্বনি কানে এলো মলিনার কাছ থেকে।—

রতীনবাবু আবার ব'ললেন, "ভয় নেই মলিনা,—সাবধান থাকলে কোনো বিপদ্ নাও হ'তে পারে ; কিন্তু এ সময় আমাদের সাহস অবলম্বন করতে হবে--নৈলে মৃত্যু অনিবার্য্য।"

সুহৃদ চাপা-গলায় আবৃত্তি করলে,

"কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ?
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
ক'রব মোরা পরিহাস।"

রতীন বাবু ব'ললেন—"দেখা যাক্"—

—'ঝট্-পট্-ঝট্'—

সেই একশো বাদুড়ের পাখার শব্দ একেবারে ওদের সাম্‌নে, —এলো ব'লে ! হঠাৎ—

হঠাৎ ওদের মাথার উপরে ফুটে উঠ্‌লো কয়েক জোড়া আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি—যেমন হিংস্র, তেমনি ক্ষুধিত।

শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে—নিশাচরের দল ওরা। এবার, এবার বুঝি ওরা ওদের শিকারের সন্ধান পেয়েছে !

—'ঝট্-পট্-ঝট্'—

সোমেনের কাণের পাশে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড পাখার ঝট্‌কা

লাগলো—চাবুকের ঘায়ের মতো! ওর চোখ-মুখের উপর দিয়ে প্রবল বাতাসের ঝলক...

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মলিনার তীব্র করুণ আর্ত্তনাদে অন্ধকার বনটা কেঁপে উঠ্‌লো,—"গেলুম, আমি গেলুম—"

রতীনবাবুর হাতের ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চের আলো অন্ধকারের চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিলে,—এম্‌নি আকস্মিক তার দীপ্তি! এতক্ষণ যে গভীর কালোর মায়ায় চোখ দু'টো আচ্ছন্ন হ'য়েছিল, তা'রা যেন হঠাৎ জেগে উঠে পথ দেখ্‌তে পেলে না...

কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড—

বিদ্যুতের আলোয় চোখে প'ড়লো এক ভীষণ দৃশ্য—কল্পনার অতীত, বিভীষিকাময়! অনেকটা বাদুড়ের মতো দেখ্‌তে,—তার চাইতে প্রায় দশগুণ বড় একটা কালো পাখী তা'র বড় বড় নখ্ বের ক'রে বিরাট পা দু'খানা দিয়ে মলিনাকে আঁকড়ে ধ'রেছে। মলিনার চেতনা নেই—আতঙ্কে সে মূর্চ্ছিত।

—মাথার উপরে যেন দশ-দশটা ফ্যান্ চালিয়ে ঘুরে ফিরছে ওর দলের আরো গোটা তিনেক পাখী—একদল ক্ষুধিত প্রেত যেন!

সোমেনের হাতের আঠারো ইঞ্চি সরু ছোরাখানা আলোয় ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌লো—তারপর সে সজোরে সেখানাকে বসিয়ে দিলে সেই রাক্ষুসে প্রাণীর পিঠের উপরে—একেবারে বাঁট পর্য্যন্ত!

পাখীটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—সে কী চীৎকার! এমন বীভৎস শব্দ যে পৃথিবীতে থাক্‌তে পারে, এ কথা কেউ কল্পনা ক'রেছে না কি কখনো?

আগুনের মতো লাল খানিকটা টক্‌টকে রক্ত—মলিনার

সারা গায়ে, পাখীটা কয়েকবার পাখা-সঞ্চালনের চেষ্টা ক'রে আছড়ে নীচে প'ড়ে গেল।

আর সেই মুহূর্ত্তে আকাশের সব ক'টা পাখী তীব্র বেগে মাথা নীচু ক'রে ওদের দিকে নেমে আস্‌তে লাগ্‌ল—আক্রমণ ক'রবার মতলবে।

সুহৃদ বন্দুকটা উঁচু ক'রে ট্রিগার টানলে।

পর-পর—দু'বার। নলের মুখে দু'বার নীল আগুনের শিখা! আরো একটা পক্ষি-পিশাচ তার পিশাচ লীলা সাঙ্গ ক'রে সঙ্গীটার পাশে ধরা-শয্যা গ্রহণ ক'রলে।

কিন্তু তখনি সুহৃদের কাঁধের উপরে একটা প্রকাণ্ড থাবা নেমে প'ড়েছে—একরাশ পাখা ওকে ঘিরে ধ'রেছে—কিসে যেন শক্ত ক'রে কাম্‌ড়ে ধ'রেছে ওর ডান হাতখানা, সেখানা নাড়বার সামর্থ্য পর্য্যন্ত সুহৃদের নেই। ওর কাঁধের 'পরে থাবার নখগুলো ক্রমশঃ ওর চামড়া ভেদ ক'রে নীচের দিকে মাংসের ভেতর নেমে যাচ্ছে—ওর ডানহাত দিয়ে ঝরঝরিয়ে প'ড়ছে টাট্‌কা রক্তের ধারা। বাঁ হাতখানা আরেকটা পায়ের নীচে চাপা,—ও নাড়তে পারছে না!

—অসহায়—মৃত্যুর মুখে শিশুর মতো অসহায়!

সোমেনের হাতে ছোরা নেই—এ অবস্থায় বন্দুক চালানো অসম্ভব! রতীনবাবু পকেট থেকে ওঁর ছ-ঘরা রিভল্‌ভারটা বের ক'রে পাখীটার উপরে তিন-চারটে গুলি চালিয়ে দিলেন।

এবার পাখীটা ওড়বার চেষ্টা করতে লাগল—সুহৃদকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় যেন! কয়েকবার দুর্ব্বলভাবে আকাশে পাখা চালালো—তারপর সশব্দে নীচে প'ড়ে গেল—সুহৃদকে আঁকড়ে নিয়ে।

সুহৃদ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো!

আরেকটা পাখী পাখার শাঁই শাঁই শব্দ ক'রে তখন দিগন্তে উড়ে চ'লেছে—সঙ্গীদের পরিণতি দেখে ভয় পেয়েছে সে!

রতীনবাবু তৎক্ষণাৎ একটা ডাল ধ'রে নীচে ঝুলে পড়লেন, তারপর লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। পিছে পিছে সোমেনও।

সুহৃদের চেতনা নেই—মৃত পাখীটার করাল আলিঙ্গনে ও বন্দী। সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা। ওরা দু'জনে তাড়াতাড়ি সুহৃদকে পাখীটার মরণ-বন্ধন থেকে উদ্ধার করলেন—তারপর চলতে লাগল চেতনা-সঞ্চারের চেষ্টা।

পূবের আকাশ সাদা হয়ে আস্‌ছে—

মলিনা গাছ থেকে নেমে এলো—মাথার চুলগুলো বিস্রস্ত, পোষাকটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, নিশীথ-পিশাচের নখের আঘাতে। চোখে ওর অপ্রকৃতিস্থ বন্য দৃষ্টি—মুখখানা পাণ্ডুর—প্রভাহীন।

অনেক প্রক্রিয়ার পর সুহৃদের জ্ঞান এলো।

—"হাঁট্‌তে পারবে তো?"—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সোমেন।

সুহৃদ ক্ষীণস্বরে ব'ললে,—"বোধ হয় পারব।"

রতীন একবার মলিনার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ব'ললেন,—"অ্যাড্‌ভেঞ্চার আমাদের এ যাত্রা যথেষ্ট হয়েছে, এবার সকলকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে হয়। সুবিধা হ'লে আজকেই রওনা হ'য়ে পড়বো। আশা করি, এতে কারো আপত্তি হবে না।"

মলিনা ভূপতিত মৃত পাখীগুলোর দিকে তাকিয়ে আরেকবার শিউরে উঠ্‌লো,—ব'ললে, "এ পিশাচের দেশ সকাল সকাল ছাড়তে পারলেই মঙ্গল।"

সোমেন বা সুহৃদ কোনো কথা কইল না। সাহস যতই থাক্—ক্রমাগত বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে মনের ভিতরে ওরা অনেকখানিই দমে গিয়েছিল। ফিরে যাওয়ার এই প্রস্তাব ওদের ভালোই লাগল এবং যদিও মুখে কিছুই ব'ললে না, তবু মনে মনে এর পূর্ণ অনুমোদন করলে।

রতীনবাবু ব'ললেন,—"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, সাইক্লোপিসাসের আবির্ভাব ঘটেনি, কয়েকটা রাক্ষুসে প্রাণীর উপর দিয়েই গেল।"

মলিনা অস্ফুট স্বরে ব'ললে—"এর উপরেও ?"

কিন্তু বিপদ্ যে তখন আর এক দিক্ দিয়ে আরো ঘনিয়ে আসছিল, সে কথা কে ভাবতে পেরেছিলো ?

আকাশটা লাল,—সেই উজ্জ্বল রাঙা রঙে সমস্ত বনটা একটা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ ক'রেছে। দু'চারটে পাখী তখন সবে জেগে উঠেছে, লতায়-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে ফিকে অন্ধকার যাই যাই ক'রছে—

ওরা তাঁবুর দিকে রওনা হ'ল।

সুহৃদ ভর ক'রেছে রতীনবাবুর কাঁধে, আর সোমেন ধ'রেছে মলিনার হাত। সরু বনের পথ দিয়ে ওরা চ'লেছে সতর্কভাবে —দু'দিকের ডালপালা নুয়ে পড়ছে ওদের গায়ের উপরে। একটা গো-সাপ চ'লে গেল ঝপ্‌ঝপ্ ক'রতে ক'রতে—মলিনা চমকে উঠ্‌লো ভীষণ ভাবে।

সোমেন ব'ললে, "ভয় কি ! ওটা গো-সাপ। আর এ তো দিনের বেলা !"

রতীনবাবু ব'ললেন, "কিন্তু তাই ব'লে অসাবধান হ'য়ো না, যেন। দিনের বেলা হ'লেও এ দেশ মোটেই নিরাপদ নয় !"

বনের পথ পেরিয়ে ওরা নেমে এলো ফাঁকা উপত্যকায়,—সামনেই ওদের তাঁবু! কিন্তু ও কী, ও কী দৃশ্য!

সমস্ত তাঁবুতে যেন কী লণ্ডভণ্ড-কাণ্ড ঘটে গেছে,—জিনিষ-পত্র চারিদিকে ছড়ানো,—দু'দিকে দু'টো বন্দুক প'ড়ে আছে, সামনে চাপ-বাঁধা খানিকটা রক্ত, আর অসংখ্য মানুষের নগ্ন পায়ের ছাপ নরম মাটিতে ফুটে রয়েছে।

রতীনবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "মণি, মহিম!—"

কোথাও কারো কোন সাড়া-শব্দ নেই, সব মড়ার মতো নিঝ্ঝুম। শুধু সমস্ত পাহাড়টা জুড়ে গম্‌গম্‌ ক'রে এ-ডাকের প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্‌লো, তাঁবুর মধ্যে কোথাও কারো চিহ্ন নেই—

মলিনা কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে ব'সে প'ড়লো—তার চেতনা নেই!

সুহৃদ এলিয়ে প'ড়লো রতীনবাবুর কাঁধের উপরে—সোমেনের বোবা বিস্ফারিত দৃষ্টি পলকহীন, স্থির···

অনেকদূর থেকে সেই ব্যাঙের বিচিত্র শব্দ কানে আস্‌ছে একটানা! শয়তানের পুরীতে যেন নহবৎ বাজ্‌ছে!

নয়

-ভালো-ভালো

সোমেনই প্রথমে কথা কইলো, "এ আবার কী ব্যাপার ?"

রতীনবাবু ম্লান হেসে ব'ললেন, "ব্যাপার আর কিছু নয় সোমেন, কাজ বাড়লো।"

—"ওরা,—ওরা গেলো কোথায় ?"

—"দেখ্‌ছ না পায়ের ছাপ, নিশ্চয়ই খাসিয়ারা এসেছিলো, ওদের বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে। ছোটোখাটো একটা যুদ্ধও হ'য়ে গেছে, রক্তের দাগ তা'র সাক্ষী দিচ্ছে।"

সুহৃদ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো, "ওরা বেঁচে আছে তো ?"

রতীনবাবুর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর, "নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তার প্রমাণ ঐ ব্যাণ্ড—ওই অদ্ভুত শব্দ। সোমেন, সুহৃদ, বি ট্রিং—আমাদের সামনে আরেকটা প্রচণ্ড বিপদ্‌, এক মুহূর্ত্ত আর বিলম্ব ক'রবার সময় নেই।"

"কেন ?" ভীতভাবে সোমেন ব'ললে।

—"ওই ব্যাণ্ড আমি কাল লক্ষ্য করিনি—কিন্তু আগে থেকেই আমাদের হুঁসিয়ার হওয়া উচিত ছিল। জানো, ও ব্যাণ্ড কিসের ?"

নিষ্প্রাণ গলায় সোমেন জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কিসের ?"

রতীনবাবু ব'লতে লাগলেন, "এই অসভ্য খাসিয়াদের মধ্যে এখনো এমন অনেক প্রথাই প্রচলিত আছে, যাদের কথা শুন্‌লে তোমাদের সভ্য-জগৎ আতঙ্কে বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে যাবে। এরা এখনো এমন অনেক মন্ত্র-তন্ত্রের চর্চ্চা করে, যাদের শক্তি অস্বীকার ক'রতে পৃথিবীর অতিবড় অবিশ্বাসীও পিছ-পা হ'য়ে দাঁড়াবে, এদের উপাস্য অনেক দেবতা আছে, তা'রা সবাই-ই প্রায় রক্তপিপাসু, হিংস্র এবং সে রক্ত হ'চ্ছে নররক্ত।"

শ্রোতারা সবাই একসঙ্গে শিউরে উঠ্‌ল।

রতীন ব'লে চ'ললেন,—"ওই যে ব্যাণ্ড শুনতে পাচ্ছ,—ও ওদের সেই পূজোর বাজ্‌না, তা'তে সন্দেহ নেই। ওদের বাজনার বিশিষ্টতা যতদূর আমি জানি—তা'তে মনে হ'চ্ছে, ওদের বলির লগ্ন আসন্ন-প্রায়। সে বলি কা'রা, সে তোমরা অনুমান করতে পারছ বোধ করি ?"

আহত কাতর সুহৃদ যেন বিদ্যুতের মতো দ্রুতবেগে উঠে ব'ললো, "তার মানে ? ওরা কী মণিদা আর মহিমকে বলি দেবার আয়োজন ক'রছে না কি ?"

রতীন ব'ললেন, "তা'তে আর সন্দেহ মাত্রও নেই।"

সোমেন আর সুহৃদ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌লো, মলিনা এত বেশী ভয় পেয়েছিল যে, ওর মুখ দিয়ে একটা চীৎকার পর্য্যন্ত বেরোলো না।

সোমেন কাঁধের উপর বন্দুকটা তুলে নিয়ে ব'ললে, "কুইক !"

সুহৃদ নীচু হ'য়ে জুতোর ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে ব'ললে, "রেডি !"

রতীন অনেকটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মলিনার দিকে তাকালেন।

একান্ত বিপদের সময় অত্যন্ত কাপুরুষও হঠাৎ সাহসী হ'য়ে ওঠে,—ভীত বুকখানা তা'র পাথরের চাইতে কঠিন হ'য়ে যায়। মলিনার ক্ষেত্রেও এ-কথাটা প্রমাণ হ'য়ে গেল। গা ঝাড়া দিয়ে সে জোরের সঙ্গেই জবাব দিলে, "আমার জন্য কোনো ভাবনা নেই, আমি ঠিক্ আছি।"

সোমেন ব'ললে, "সঙ্গে আস্‌বে নাকি ?"

—"নিশ্চয়।"

রতীন ব'ললেন, "অল্‌রাইট !"

সুহৃদ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, ব'ললে, "আর তো দেরী করা যায় না রতীনবাবু! হয়তো এর মধ্যে কোন সময় ওদের কেটেই ফেল্‌বে—"

আবার চলা সুরু হ'ল—

সেই দুর্গম বনের পথ, দু'ধারে নুয়ে-আসা নিবিড় গাছের সারি, অন্ধকারকে রেখেছে বন্দী ক'রে। নীচে কাঁটার ঝোপ,—ওদের মোজা ছিঁড়ে পা ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিতে চায়। লতার জাল দুর্ভেদ্য, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে পথ চলতে হয়,—দু'ধারে পাওয়া যায় অসংখ্য বুনো-জন্তুর সাড়া।

তার ভিতর দিয়েই ওরা চলেছে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে। অগণিত বাধা ওদের পদে পদে ব্যাহত করছে, জুতোয় উঠ্‌ছে ফোস্কা, ক্লান্তিতে ভেঙে প'ড়তে চায় পা দু'টো। মাথার ভেতরে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার জাল বুন্‌ছে—

তবুও চ'লতে হবে ওদের,—এক মুহূর্ত্ত সময় নেই দাঁড়াবার, —এতটুকুও অবকাশ নেই বিশ্রাম ক'রবার। সামনে পিছনে ওদের মৃত্যুর সাড়া,—দুঃসাহসিক ওদের অভিযান!

ব্যাঙের বিচিত্র শব্দ ক্রমশঃই কাছে আস্‌ছে—

—আরো কাছে—আরো কাছে—

হঠাৎ…

একটা মোড় ফিরতেই জঙ্গলের পথটা শেষ হ'য়ে গেল আর সামনে দেখা গেল এক কল্পনাতীত ছবি, যেমন বিচিত্র, তেম্‌নি আতঙ্ককর।

অসমতল একটা দীর্ঘ মাঠ,—মাঝে মাঝে দু'টো-চারটে আল্‌গা ঝোপ। পাথরের টুক্‌রোর পাশে পাশে বড় বড় ঘাস উঠেছে। আর সেই মাঠের মাঝখানে—

—তিনশো বা, তা'র চাইতেও বেশী লোক জমা হ'য়েছে।

একমাথা ক'রে ঝাঁকড়া তাদের রুক্ষ চুল,—গলায় হাড়ের টুক্‌রোর মালা। চাপা নাকের নীচে তাদের বীভৎস কালো তামাটে মুখগুলো একটা হিংস্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল। পরণে তাদের সামান্য একটু পরিধেয় আছে কি নেই,—হাতে তীক্ষ্ণ-ধার এক-একটা বর্শা নিয়ে মাঝখানে জ্বলন্ত একটা প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে ওরা তাণ্ডব তালে নৃত্য ক'রছে আর সেই সঙ্গে গান চ'লছে—"ডামা—ডালো—ডালো—"

সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক গলায় একরকমের চামড়ার বড় বড় ঢাক দুলিয়ে প্রবল শব্দে বাজাচ্ছে আর বাজাচ্ছে। আর ওদের সাম্‌নে—

একটা দীর্ঘকায় সরল গাছের সঙ্গে ঠেসান-দেওয়া কাঠের তৈরি একটা বিচিত্র দেবমূর্ত্তি। দেবমূর্ত্তিই বটে! এমন বিভীষিকাময় চেহারা কোন দেবতার থাকতে পারে, এ কল্পনাও করা যায় না। মূর্ত্তিটা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ'হাত, প্রস্থে দু'হাতের কম নয়! তা'র দেহের আধাআধি তা'র মাথাটা, অনেকটা জগন্নাথের মাথার মতো চ্যাপ্টা চার-কোণা। বিরাট একটি নাক যেন মিশরের পিরামিডের মতো উঁচু হ'য়ে আছে,—সেই নাকের নীচে একখানা ততোধিক বিরাট হাঁ-করা মুখ। সে মুখে কুকুরের দাঁতের মতো বড়ো বড়ো দু'পাটি ত্রিকোণাকার দাঁত,—কালো রক্তের ধারা সেই কাঠের দাঁতগুলিতে, মুখের মাঝখানে এবং গালের দু'পাশে শুকিয়ে আছে। ভাঁটার মতো গোল দু'টো চোখ সিঁদুর-মাখানো—যেন সে মূর্ত্তি রাগে রাঙা টকটকে দু'টো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। শরীরের আর কোথাও কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বালাই নেই।

আর সেই মূর্ত্তির পায়ের নীচে লতায়-পাতায় জড়িয়ে বাঁধা

প’ড়ে আছে মণি আর মহিম,—ওদের দেহে প্রাণ আছে কিনা কে ব’লবে?

রতীন ব’ললেন, “এবার বন্দুক তোলো, ফায়ার করতে হ’বে। সঙ্গে টোটা আছে যথেস্ট—এই ঝোপের আড়ালে থেকে নিশ্চয় জিত্‌তে পার্‌ব ওদের। ওয়ান্—টু—”

কিন্তু “থ্রি” ব’লবার আগেই পিছন থেকে কা’রা একসঙ্গে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে প’ড়লো—ওদের আত্মরক্ষার অবকাশ মাত্রও দিলে না।

কখন যে একদল খাসিয়া ওদের দেখ্‌তে পেয়ে পিছন দিয়ে এসে আক্রমণ ক’রেছে, তা’ ওরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। টের পেলো তখন যখন ওদের সর্ব্বাঙ্গ নিবিড় ক’রে বাঁধা হ’য়ে গেল,—ওদের হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রইল না। শুধু শক্তি রইলো নিরুপায় ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবার এই অসভ্য-দের হাতে ওদের অন্তিম পরিণতির।

মলিনার চেতনা আবার লুপ্ত হ’য়েছে…

সুহৃদেরও বোধ করি তাই-ই…

শুধু সোমেন সচেতন ছিল এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়েও। রতীন চুপি চুপি ব’ললেন,—“ভয় নেই সোমেন!”

সোমেন ম্লান একটু হাসলো,—“ভরসাও বড় দেখ্‌তে পাচ্ছি না।”

তারপরে সে কী উল্লাস! বিকট আনন্দের চীৎকারে সমস্ত খাসিয়া এসে জড়ো হ’ল ওদের চারিদিকে, তা’রপরে ওদের চারজনকে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে তুলে’ নিয়ে আছড়ে ফেল্‌লে মণি আর মহিমের পাশে!

মণির জ্ঞান ছিল না,—মহিম বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক’রে তাকিয়ে ব’ললে, “তোমরাও!”

এবার আরো জোরে ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল—নৃত্য চ'লতে লাগলো আরো জোরে—ওদের উল্লাস আর বাধা মানে না। ওরা বলি পেয়েছে আশার অতিরিক্ত,—আজ ওদের দেবতাকে ওরা পরিতৃপ্ত ক'রবে পরিপূর্ণ ভাবে।

সোমেন ব'ললে,—"এখন উপায় ?"

রতীন ব'ললেন,—"দেখা যাক্‌ !"

ব'ললেন বটে, কিন্তু তখন কারোই বুঝতে বাকী ছিল না যে, এখন আর কোনো উপায় নেই—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। সোমেন একবার প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রলে সর্ব্বাঙ্গের বাঁধন ছিন্ন করবার,—কিন্তু সে অসম্ভব !

হঠাৎ ব্যাণ্ডের শব্দ বেজে উঠ্‌ল একটা বিচিত্র ধরণে,—একদল খাসিয়া ছুটে এসে টেনে তুল্‌ল মণিদা'কে। মণিদা'র অস্ফুট গোঙানিতে টের পাওয়া গেল যে তাঁর দেহে তখনো প্রাণ আছে।

তারপরে—

একটা অতি ভয়ানক দৃশ্যের অনুষ্ঠান হ'তে লাগলো ওদের চোখের সম্মুখে। অদূরে মাটিতে পোঁতা ছিল একটা কাঠের তে-কোণা জিনিষ—ওরা দেখেও বুঝতে পারেনি যে ওটা কী ! এবার ঠিক্‌ চিন্‌লে, ওটা হাঁড়িকাঠ !

ওরা মণিকে নিয়ে ফেললে সেই হাঁড়িকাঠের উপরে,—গলাটা বসালে ঠিক্‌ জায়গা মতই। তারপরে এলো সিঁদুর-মাখানো প্রকাণ্ড একখানা খড়গ,—সূর্য্যের আলোয় ঝলমল্‌ ক'রে জ্বলছে সেখানা।

যা'রা নাচ্‌ছিল,—তা'রা এবার একের পরে একে, ওই খড়গখানাকে বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অগ্নি-কুণ্ডের চারপাশে তেমনি ক'রেই নাচতে লাগল। কণ্ঠে তাদের সেই বিকট-সঙ্গীত—

"ডামা—ডালো—ডালো—"

ব্যাপারখানা যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা ওদের বুঝতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয়নি'। অসহায় উন্মত্ত কণ্ঠে সোমেন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—রতীন পাগলের মতো বাঁধন ছিঁড়বার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ক'রতে লাগলেন—মহিমের আর্ত্ত-ক্রন্দনে ভ'রে উঠ্‌ল দিগ্‌দিগন্ত!

কিন্তু কোনো ফল নেই। নৃত্যের তাণ্ডব আর ব্যাণ্ডের প্রবল রবের মাঝখানে ওদের সে কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে গেল! হাতে হাতে ঘুরে খড়গ ফিরে এলো—তারপরে বিকট-মূর্ত্তি এক খাসিয়া সেই খড়গ হাতে ক'রে এগিয়ে গেল হাঁড়িকাঠের দিকে, —যেখানে মণি পড়ে আছে অচেতন হ'য়ে।

রতীন ব'ললেন, "সোমেন! আমাদের সকলের শেষ-পরিণতি ওই-ই—"

সোমেন দীর্ণ কণ্ঠে বললে, "রতীনবাবু, কোনো মতে একবার যদি নিজেদের মুক্ত করতে পারতুম,—তা' হ'লে—"

খাসিয়াটা খড়গ নিয়ে নতজানু হ'য়ে এসে ব'স্‌ল মণিদার পাশে। ব্যাণ্ডের আকাশ-ফাটানো শব্দের সাথে সাথে শোনা যেতে লাগলো পৈশাচিক সঙ্গীত—

"ডামা—ডালো—ডালো—"

খাসিয়াটা কোপ্‌ দেবার জন্য খড়গ তুললে—সাতঙ্কে ওদের চোখ্‌গুলো মুদ্রিত হ'য়ে গেল!

দশ
খাসিয়াদের রাজা

কিন্তু হঠাৎ—

ব্যাঙের বাজনা আর এতগুলি মানুষের মিশ্রিত বিকট কলরব একসঙ্গে গেল স্তব্ধ হ'য়ে—যেন কোন্ মন্ত্র-বলে নেমে এলো বিরাট মৌন !

বলি কি হ'য়ে গেল ?

ওরা ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখ্‌লে আর একটা নতুন দৃশ্য ! ওদিকের জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে আস্‌ছে আরো একদল খাসিয়া—সর্ব্বাঙ্গে উল্কি-পরা, হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। মাথায় ওদের পাখীর পালক-গোঁজা,—বেশ-বাস এক নতুন রকমের !

তাদের সকলের আগে একজন লোক আস্‌ছে—রঙ্ ওদের মতো নয়, বরঞ্চ বেশ ফর্সা। অনেকটা বাঙ্গালীদের মতো ক'রে কাপড়-পরা—দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তারই মাথায় পাখীর পালকের মুকুট—দু' কানে বড় বড় বীর-বৌলি, হাতে দু'টো তামার বালা। তার চাল-চলনের মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য এবং গাম্ভীর্য্য—এগিয়ে আস্‌ছে সে বড় বড় পা ফেলে।

এদিকে এদের নাচ গিয়েছে থেমে, ব্যাঙও বন্ধ হয়েছে। এরা সবাই একসঙ্গে সামনের দিকে মাথা নুইয়ে অনেকটা প্রণাম করবার ভঙ্গিতে শরীরটা দিয়েছে ঝুঁকিয়ে। বলি দেবার জন্য যে খড়্গ তুলেছিল, সে খড়্গ নামিয়ে রেখে অন্যান্য সকলের মতোই তা'কে জানাচ্ছে অভিনন্দন।

রতীন চুপি চুপি ব'ললেন, "খাসিয়াদের রাজা।"

সোমেনকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে উন্মাদের মতো হাতী
আবার ছুটে চল্‌লো।

সুহৃদ বিস্মিত সুরে ব'ললে, "কিন্তু ওর চেহারা তো মোটেই খাসিয়াদের মতো নয়!"

সোমেন ব'ললে, "সত্যি আশ্চর্য্য যে ওকে অনেকটা বাঙ্গালীর মতো দেখ্‌তে! ওর জাত-ভাইদের সঙ্গে কোনোখানে কোনো সামঞ্জস্য নেই।"

মহিম কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলে, "থাক্‌ না থাক্‌, তা'তে আমাদের সমানই লাভ। আমাদের প্রাণতো আজ তা'তে বাঁচবে না। এতক্ষণ তবু জ্যান্ত ছিলুম্‌, হয়তো রাজা এবার সবাইকে এক সঙ্গেই কাট্‌বার হুকুম দেবে!"

—"বুঙা—বো"—

রাজার একটা বিকট চীৎকারের সঙ্গে ওরা সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো,—তারপর ওদের ঢাল, বল্লম, খড়্‌গ প্রভৃতি একসঙ্গে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে দূরে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়ালো—যেন আদেশের প্রতীক্ষা করছে।

হাঁড়ি কাঠের উপরে মণিদা তেম্‌নি ক'রেই প'ড়ে—শরীরে এতটুকু স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না, বেঁচে আছে কিনা, তাইই বা কে ব'লতে পারে? একে তো ভীতু মানুষ, তারপর বারবার এই স্নায়ুর উত্তেজনা,—যে কোনো সময় হার্টফেল হওয়াও বিচিত্র নয়।

রাজা সদলবলে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল—

রতীন ব'ললেন, "কোন অজ্ঞাত কারণে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের প্রাণদণ্ড মকুব রইল, সোমেন!"

সোমেন ব'ললে, "তাই তো দেখছি!"

মহিমের ঠোঁট দুটো কাঁপছিল,—বোধ হয় অস্ফুট স্বরে সে জপ করছিলো কোনোরকম মন্ত্রতন্ত্র। অথবা অতিরিক্ত আতঙ্ক হওয়াও বিচিত্র নয়।

মলিনার মুখখানা পাথরের মতো পাণ্ডুর—সেখানে রক্তের

চিহ্নও নেই। তা'র চেতনা তখনো ভালো ক'রে জাগেনি। সুহৃদের মুখ দেখেও কিছুই অনুমান করা চলে না।

হঠাৎ ঘট্‌ল একটা আশ্চর্য্যতম ব্যাপার! স্বপ্নেও যা কখনো কল্পনা করা যায় না, তাইই!! আকাশ হঠাৎ ভেঙে পড়লেও মানুষ এত বিস্মিত হয় না!

খাসিয়াদের রাজা ওদের কাছে এসে রতীনবাবুকে দেখেই বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় "একি স্যার, আপনি!"

রতীনবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বজ্রাহতের মতো, "জ্ঞানেন্দ্র, তুমি! তুমি এখনো বেঁচে আছ!"

জ্ঞানেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়েই কী একটা আদেশ ক'রলে, একদল খাসিয়া দ্রুত ছুটে এসে ওদের বাঁধন খুলে দিলে। মণিদার দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেন্দ্র ব'ললে, "এ যে মিহির-বাবুকেও দেখ্‌ছি!"

মণিদা'র মাথা তখনো প্রকৃতিস্থ হয়নি—তিনি শুধু বোকার মতো অর্থহীন বোবা-চোখে জ্ঞানেন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন!

আর ওদের সকলের মনে হ'ল যেন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখ্‌ছে! সোমেন দু'হাতে চোখ কচ্‌লালো,—সুহৃদ উত্তেজনায় একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—মলিনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, আর মহিম ভেউ ভেউ ক'রে একেবারে কেঁদেই ফেল্‌লে।

রতীন কলের পুতুলের মত আবার ব'ললেন, "তুমি তা' হ'লে এখনো বেঁচে আছো?"

জ্ঞানেন্দ্র হাস্‌ল, "হাঁ, স্যার, বেঁচে আছি বই কি! নইলে খাসিয়াদের রাজা হ'লুম কেমন ক'রে?"

* * * *

জ্ঞানেন্দ্র ব'লে চ'লেছে, "সেই বিরাটকায় রুদ্র-মূর্ত্তি প্রাণী-গুলোর কাছ থেকে আত্মরক্ষা ক'রবার জন্য প্রাণপণে ছুটতে ছুটতেই দেখলাম, আপনার এরোপ্লেনখানা আকাশের পারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল! এবারে আমার শেষ আশাও শেষ হ'ল,—মৃত্যু-ছাড়া আর কোনো পথ রইল না!

কিন্তু ভগবানের করুণার কথা কে ব'লতে পারে! পেছন থেকে সেই মৃত্যুদূতের দল যখন করাল মূর্ত্তিতে তাড়া ক'রে আস্ছে, তখন দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ পথের মাঝখানে ন'-দশ হাত গভীর একটা শুক্‌নো গর্ত্তের মাঝখানে প'ড়ে গেলাম। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চেতনা-লোপ হ'য়ে গেল, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, এ হ'য়েছিল আমার পক্ষে শাপে বর!

আমি যে এই গর্ত্তের মাঝখানে প'ড়ে গেছি, তা' ওরা টের পায়নি;—সেই অতিকায় রাক্ষুসে প্রাণীর দল তাই আমাকে ডিঙ্গিয়ে চ'লে গিয়েছিল! অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হ'ল,—তখন আমার সমস্ত অবস্থাটা মনের মাঝখানে ভেসে' উঠ্‌ল বিদ্যুতের চমকের মত। আস্তে আস্তে গর্ত্তের উপরে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতে লাগলাম, পাথরের উপরে পা দিয়ে দিয়ে উঠ্‌তেও পারলাম অবশেষে।

এবার ধীরে ধীরে দু'-চার পা এগোতেই আরেকটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ দেখি একদল খাসিয়া বাদ্য-বাজনা এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অত্যন্ত সমারোহ-সহকারে আমার দিকেই ছুটে আস্‌ছে। ভাবলাম, এক বিপদ্ থেকে উদ্ধার না পেতেই পড়লাম আর এক বিপদের মুখে! এবার আর কোনোমতেই প্রাণের আশা নেই।

ভাগ্যের উপরেই নিজেকে দিলাম ছেড়ে।

—কিন্তু, ওরা একি চীৎকার করছে? কী আশ্চর্য্য!

খাসিয়াদের ভাষা জানতাম ; বুঝলাম, ওরা ব'লছে 'রাজা ! রাজা ! আমাদের রাজা এসেছে !—'

রাজা ! কিন্তু আমাকেই তো ব'লছে ওরা ! পৃথিবীতে এর চাইতে বড় বিস্ময় আর কী হ'তে পারে ? রাজা !

হ্যাঁ, রাজাই তো ! ওরা সকলে এসে সাষ্টাঙ্গে আমার কাছে নত হ'য়ে পড়ল। আমার মনে হচ্ছিল, হয় আমি পাগল হ'য়ে গেছি, নইলে দেখছি এলোমেলো খেয়াল !

জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হ'য়েছে ?"

সকলের মিশ্রিত কলরবের মাঝখান থেকে এইটুকুই জানা গেল যে, কিছুদিন আগে ওদের রাজার স্বর্গলাভ হ'য়েছে। তার মরবার পরে যখন কে রাজা হবে এই নিয়ে প্রবল গণ্ডগোল চলছিল, তখন ওদের বুড়ো সর্দ্দার বলেন যে, সে স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়েছে যে, বিদেশ থেকে ওদের নতুন রাজা শীগ্‌গিরই ওদের মাঝে এসে উপস্থিত হবে। সেই স্বপ্নের রাজার সঙ্গে আমি নাকি একেবারে মিলে গেছি, তাই আমার এই রাজ-সম্মান।

তারপর ?

—তারপর থেকেই আমি এদের রাজা।

পালাবার চেষ্টা অনেকবারই ক'রেছি,—কিন্তু পথঘাট চিনি নে,—কী ক'রে কোথায় যাব ? তাই বাধ্য হ'য়েই এদের সঙ্গে এতদিন পশুর মত জীবন যাপন ক'রছি।"

* * * *

রতীন্ এঞ্জিনটা বন্ধ ক'রে ব'ললেন, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, দু' ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হ'তে পারব।"

মণিদা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে, "যাক্, তবু ভরসা হলো।"

সোমেন ওদিকে রান্নার তদারক করছিল, ক্ষুণ্ণস্বরে ব'ললে, "কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল যে, সাইক্লোপিসাসের সঙ্গে আর দেখাটা করা হ'য়ে উঠ্ল না।"

সুহৃদ বন্দুকের নলটা সাফ্ করতে করতে ব'ললে, "তাই তো!"

মলিনা ভ্রূকুটি ক'রে ব'ললে, "থাক্ যথেস্ট হয়েছে, এ যাত্রা আর অ্যাড্ভেঞ্চার করবার দরকার নেই, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলে বাঁচি!"

মণিদা বিশেষ কিছু ব'ললেন না। একবার আহত হাতটার পানে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "ত্র্যহস্পর্শ!"

মহিম হাতা দিয়ে মাংসটা নাড়্তে নাড়্তে ব'লে উঠ্লো, "ঠিক কথাটি ব'লেছ, দিদিমণি! এখন বাড়ি ফিরতে পারলে নগদ পাঁচসিকের হরির লুট দেব!"

জ্ঞানেন্দ্র হেসে ব'ললে, "আচ্ছা, সাইক্লোপিসাসের সঙ্গে দেখাটা না হয় পরের অ্যাড্ভেঞ্চারেই হ'বে। কিন্তু আমরা তো পথঘাট চিনি নে,—কী ক'রে ফির্বে, এইটেই হ'চ্ছে সমস্যা!"

রতীন্ হাতের আস্তিন গুটিয়ে এঞ্জিনে পেট্রোল ঢাল্ছিলেন। কথাটা কানে যেতে মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "সঙ্গে কম্পাস আছে জ্ঞানেন্দ্র, আর আছে সাত দিনের মতো পেট্রোল! এর মধ্যে যদি গৌহাটী না খুঁজে নিতে পারি, তা' হ'লে এতদিন বৃথাই পাইলটিং শিখেছি।"

—শেষ—